Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারের সফলতায় আমাদের যা করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ হালিমা

রোলঃ 22802047

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারের সফলতায় আমাদের যা করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ হালিমা
রোলঃ 22802047

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারের সফলতায় আমাদের যা করনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কানিজ হালিমা , আইডিঃ 22802047 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারের সফলতায় আমাদের যা করনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

কানিজ হালিমা

আইডিঃ 22802047

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা:

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি

আহমদিয়া মুসলিম জামাত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে মির্জা গোলাম আহমদ (১৮৩৫-১৯০৮) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় আন্দোলন । এটি ইসলামের একটি পুনর্জাগরণবাদী বা মশীহ আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । যদিও এর অনুসারীরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবেই দাবি করে থাকেন এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও স্তম্ভগুলো মেনে চলেন , মূলধারার সুন্নি মুসলিমদের একটি বড় অংশ আহমদিয়াদের 'অমুসলিম' হিসেবে গণ্য করে । এই মতপার্থক্য এবং এর ফলস্বরূপ সৃষ্ট বিরোধ বিশ্বজুড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জন্য এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

আহমদিয়া জামাত বিশ্বব্যাপী একটি সুসংগঠিত সম্প্রদায়। বর্তমানে এটি পৃথিবীর ২১৩টি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এর বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র লন্ডনে অবস্থিত । মির্জা গোলাম আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা খিলাফত প্রবর্তন করেন এবং বর্তমানে মির্জা মাসরুর আহমদ এই সংগঠনের পঞ্চম খলিফা হিসেবে লন্ডন থেকে কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন । বিশ্বজুড়ে আহমদিয়াদের অনুসারীর সংখ্যা ১ থেকে ২ কোটি বলে অনুমান করা হয় । বাংলাদেশেও আহমদিয়া জামাতের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে; ১৯১৩ সালে হাকিম নূর-উদ-দীনের খেলাফতের সময় সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলে এটি একটি সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় । ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে আনুমানিক ১,০০,০০০ আহমদিয়া সদস্য ছিল । বর্তমানে সারা দেশে ১০৩টি শাখা এবং ৪২৫টি স্থানে আহমদীদের বসবাস বা কার্যক্রম রয়েছে, যা স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রতিবেদন আহমদিয়া জামাতের উৎপত্তি, তাদের মূল ধর্মীয় বিশ্বাস, মূলধারার ইসলামের সাথে তাদের মতপার্থক্য এবং এই ভিন্নতার কারণে সৃষ্ট বিরোধ ও নিপীড়নের কারণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশদভাবে তুলে ধরবে। আহমদিয়া জামাতের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ ১৮৩৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৮ সালের ২৬ মে লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন । তাঁর জীবনকাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। এই সময়েই তিনি তাঁর ধর্মীয় দাবিগুলো উত্থাপন করেন এবং একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে ১৪ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (আধ্যাত্মিক সংস্কারক), প্রতিশ্রুত মসীহ, মাহদি, নবী এবং খলীফা হিসেবে

দাবি করেন । তাঁর এই দাবিগুলো তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে 'বারাহীনে আহমদীয়া' অন্যতম । তিনি স্পষ্ট ভাষায় নিজেকে নবী ও রসূল হিসেবে ঘোষণা করেন, যেমনটি ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ প্রকাশিত 'বদর' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন: "আমি নবী এবং রসূল- এই আমার দাবী।" । তিনি আরও লেখেন: "আমি খোদার হুকুম অনুসারে একজন নবী।" । এই নবুওয়তের দাবিই পরবর্তীতে মূলধারার মুসলিমদের সাথে আহমদিয়াদের বিরোধের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আহমদিয়া আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে লুধিয়ানায় "বয়াত" (আনুগত্যের শপথ) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় । প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ১৮৯৬ সালে যেখানে এর অনুসারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০ জন, ১৯১৮ সালের মধ্যে তা বেড়ে ৭০ হাজারে পৌঁছায় । মির্জা গোলাম আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ভারতের মতো বিভিন্ন দেশে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করেন । এসব অঞ্চলে মসজিদ স্থাপন এবং ধর্ম প্রচারে আহমদিয়া জামাত বিশেষ গুরুত্ব দেয় ।বাংলাদেশে আহমদিয়া জামাতের আগমন ঘটে ১৯০৫ সালে, যখন চট্টগ্রামের আনোয়ারা নিবাসী আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ মির্জা গোলাম আহমদের হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। এরপর কিশোরগঞ্জের রইস উদ্দিন খাঁও এই ধর্মে যোগ দেন । ১৯১৩ সালে হাকিম নূর-উদ-দীনের খেলাফতের সময় সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলে আহমদিয়া ধর্ম একটি সংগঠিত সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ' নামে পরিচিত । বাংলাদেশের পঞ্চগড় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ক্ষুদ্র পরিসরে আহমদিয়া জামাতের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে সারা দেশে ১০৩টি শাখা এবং ৪২৫টি স্থানে আহমদীদের বসবাস বা কার্যক্রম রয়েছে । জামাতের সাংগঠনিক কার্যক্রম স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ৬৫ জন ধর্মপ্রচারক (মোবাল্লেগ) এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন । ১৯২০ সাল থেকে তারা বাংলাদেশের প্রাচীনতম পাক্ষিক পত্রিকা 'আহ্‌মদী' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে ।

ধর্মতাত্ত্বিক মতপার্থক্য: বিরোধের মূল ভিত্তি

আহমদিয়া মুসলিম জামাত এবং মূলধারার সুন্নি মুসলিমদের মধ্যে বিরোধের প্রধান কারণ হলো ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসে বিদ্যমান মৌলিক পার্থক্য, বিশেষ করে 'খতমে নবুওয়ত' (নবুওয়তের সমাপ্তি) এবং হযরত ঈসা (আ.) এর অবস্থান সম্পর্কিত ব্যাখ্যায়। এই মতপার্থক্যগুলোই আহমদিয়াদের 'অমুসলিম' ঘোষণার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

খতমে নবুওয়ত (নবুওয়তের সমাপ্তি) নিয়ে বিতর্ক ইসলামের মূলধারার বিশ্বাস অনুযায়ী, হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না। এই বিশ্বাসকে 'খতমে নবুওয়ত' বা 'নবুওয়তের চূড়ান্ততা' বলা হয়, যা ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তি এবং ধর্মীয় ঐক্যের প্রতীক । পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কাউকে (নবী) নয়, বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী।" । সহিহ মুসলিমের একটি হাদিসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "আমি হচ্ছি শেষ নবী, আর আমার পর আর কোনো নবী আসবে না।" । এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করাকে মূলধারার মুসলিমরা কুফরি বা ইসলাম থেকে বিচ্যুতির সমার্থক মনে করে । অন্যদিকে, আহমদীয়ারা বিশ্বাস করে যে মির্জা গোলাম আহমদ ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা পুনর্জাগরণের জন্য প্রেরিত হয়েছেন । তাদের মতে, 'খাতামান্নাবিয়ীন' এর অর্থ 'নবীগণের মোহর' বা 'নবীগণের সত্যায়নকারী', নবুওয়তের আক্ষরিক সমাপ্তি নয় । আহমদিয়ারা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে 'উম্মতী নবী'র (অধীনস্থ নবী) ধারণা পোষণ করে, যার অর্থ হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত অনুসরণের মাধ্যমে নতুন নবী আসতে পারবেন, তবে তিনি কোনো নতুন শরীয়ত বা জীবনবিধান আনবেন না । মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে এমন একজন 'উম্মতী নবী' হিসেবে দাবি করেছেন, যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর অধীনস্থ এবং তাঁরই শিক্ষা প্রচারের জন্য এসেছেন । এই দাবিটি মূলধারার মুসলিমদের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য, কারণ তারা মনে করেন যে এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী ।

হযরত ঈসা (আ.) এর অবস্থান নিয়ে বিতর্ক

হযরত ঈসা (আ.) বা যীশু খ্রিষ্টের অবস্থান নিয়েও আহমদিয়া ও মূলধারার মুসলিমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতপার্থক্য রয়েছে। মূলধারার মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে সশরীরে আসমানে তুলে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন । হাদিস অনুযায়ী, তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে একটি সাদা মিনারের পাশে অবতরণ করবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সালাত আদায় করবেন । তাদের মতে, ইমাম মাহদী এবং মসীহ (ঈসা) দুইজন আলাদা ব্যক্তি হবেন ।

এর বিপরীতে, আহমদীয়ারা বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা (আ.) সশরীরে আসমানে উত্থিত হননি; বরং তিনি এই পৃথিবীতেই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর পর বেহেশতে চলে গেছেন । তাদের যুক্তি হলো, যদি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে বেহেশত থেকে হযরত ঈসা (আ.)-কেই পাঠাতে হয়, তাহলে তা 'খাতামান্নাবিয়ীন' হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মর্যাদার পরিপন্থী হবে । তাদের মতে, পবিত্র কুরআনে ঈসা (আ.)-কে বনী ইসরাঈল জাতির নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । তাই তিনি যদি পুনরায় আগমন করেন, তবে তিনি কুরআনের নিয়মের বাইরে গিয়ে মুসলমান জাতির জন্য নবী হতে পারেন না। আহমদীয়ারা বিশ্বাস করে যে, যীশুর দায়িত্ব পালন করার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকেই কেউ একজন উঠে আসবেন যিনি ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবেন, এবং এই ব্যক্তি হলেন মির্জা গোলাম আহমদ । এই বিশ্বাসটি মূলধারার মুসলিমদের দ্বারা সমালোচিত হয় এবং তাদের অমুসলিম ঘোষণার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয় ।

আহমদিয়া জামাতের জিহাদের সম্পর্কে ধারণা

আহমদিয়া মুসলিম জামাত জিহাদের ধারণাকে মূলধারার কিছু ব্যাখ্যা থেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। তারা 'জিহাদ'কে মূলত আত্মশুদ্ধি, ধর্ম প্রচার এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের সত্যতা তুলে ধরার একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংগ্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করে । তাদের মতে, সশস্ত্র জিহাদ কেবল আত্মরক্ষার জন্য বৈধ, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য নয়।

সারণী ১: আহমদিয়া ও মূলধারার মুসলিমদের মধ্যে প্রধান ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	মূলধারার সুন্নি মুসলিমদের বিশ্বাস	আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বাস
খতমে নবুওয়ত	হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী; তাঁর পর কোনো নবী আসবেন না।	হযরত মুহাম্মদ (সা.) 'খাতামান্নাবিয়ীন' অর্থাৎ 'নবীগণের মোহর' বা 'সত্যায়নকারী'; তাঁর প্রকৃত অনুসরণে 'উম্মতী নবী' আসতে পারেন, যিনি নতুন শরীয়ত আনবেন না। মির্জা গোলাম আহমদ এমন একজন 'উম্মতী নবী'।
মির্জা গোলাম আহমদ	মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার; কাফের বা অমুসলিম।	প্রতিশ্রুত মসীহ, মাহদি, মুজাদ্দিদ ও 'উম্মতী নবী'।
হযরত ঈসা (আ.)	সশরীরে আসমানে উত্থিত হয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।	পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন; প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে মির্জা গোলাম আহমদ এসেছেন।
জিহাদ	আত্মরক্ষা ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় সশস্ত্র সংগ্রাম বৈধ; আত্মশুদ্ধি ও ধর্ম প্রচারও এর অংশ।	প্রধানত আত্মশুদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ ধর্ম প্রচার; সশস্ত্র সংগ্রাম কেবল আত্মরক্ষার জন্য।

আহমদিয়াদের প্রতি বিরোধ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আহমদিয়া জামাতের প্রতি বিরোধিতা তাদের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল, তবে এর তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বিশেষ করে ব্রিটিশ ভারত বিভাজন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর। এই বিরোধিতা কেবল ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে।

১৯৫২ সালে জামায়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ও আমির মওদুদী 'কাদিয়ানী মাসালা' নামের একটি বই প্রকাশের মাধ্যমে আহমদিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত বিরোধিতা শুরু করেন । এই বইটি আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে ইসলামবিরোধী বিশ্বাস ও ইসলাম ধর্ম বিকৃতির অভিযোগ আনে এবং তাদের 'অমুসলিম' ঘোষণার দাবিতে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় । এর ফলস্বরূপ, ১৯৫৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পাঞ্জাবে আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়। এই দাঙ্গায় প্রায় ২০০০ লোক নিহত হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পাঞ্জাবে সামরিক আইন (মার্শাল ল) জারি করা হয়, যা পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সামরিক আইন । এই ঘটনা আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিপীড়নের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

আহমদিয়াদের প্রতি এই বিরোধের একটি কারণ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি তাদের অবস্থান। মির্জা গোলাম আহমদ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও প্রচারের সুযোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিলেন । এটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানি মুসলিমদের মধ্যে তাদের প্রতি এক ধরনের সন্দেহের জন্ম দেয়। ১৯৭৪ সাল আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এই বছর পাকিস্তানের সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে আহমদিয়াদের আনুষ্ঠানিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয় । এই সাংবিধানিক পরিবর্তনটি মূলত রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর দীর্ঘদিনের চাপ এবং সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সাল বিন আস-সাউদের প্রভাবের ফল ছিল । এই সংশোধনীর ফলে আহমদিয়ারা পাকিস্তানের আইনে মুসলিম হিসেবে তাদের পরিচয় হারায় । এটি কেবল একটি ধর্মীয় ফতোয়া ছিল না, বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের নাগরিক অধিকার খর্ব করার একটি আইনি ভিত্তি তৈরি করে। এই সাংবিধানিক ঘোষণার পর, ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক 'অর্ডিন্যান্স XX' জারি করেন । এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আহমদিয়াদের নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করা বা 'মুসলিম হিসেবে ভান করা' নিষিদ্ধ করা হয় । এর ফলে তারা প্রকাশ্যে ইসলামিক কালেমা উচ্চারণ, তাদের উপাসনালয়কে মসজিদ বলা, মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী সালাম ব্যবহার, কুরআন থেকে প্রকাশ্যে উদ্ধৃতি দেওয়া,

ধর্ম প্রচার করা বা ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা, এবং তাদের ধর্মীয় প্রকাশনা তৈরি ও বিতরণ করা থেকে আইনত বঞ্চিত হয় । এই কাজগুলো করলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয় । এই আইনগুলো কার্যকরভাবে রাষ্ট্রকে 'মুসলিম' শব্দের অর্থ নির্ধারণের একচেটিয়া অধিকার দেয়, যা আহমদিয়াদের প্রতি নিপীড়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং তাদের প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে । এই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ দেখায় যে, আহমদিয়াদের প্রতি বিরোধ কেবল ধর্মতাত্ত্বিক মতপার্থক্যের ফল নয়, বরং এটি রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় পরিচয়ের সংজ্ঞায়নের জটিল interplay থেকে উদ্ভূত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং আইনি বিধিনিষেধের কারণে এই বিরোধ আরও গভীর ও সহিংস রূপ ধারণ করেছে।

বর্তমান পরিস্থিতি: আইনি বিধিনিষেধ, সামাজিক প্রতিরোধ আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি আইনি বিধিনিষেধ, সামাজিক প্রতিরোধ, বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে, একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। পাকিস্তানের মতো দেশে এই প্রতিরোধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে, যা অন্যান্য দেশেও এখন প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়ার চেষ্টা করছে । বাংলাদেশের মূল ধারার মুসলিম নেতারা কাদিয়ানীদের নিষিদ্ধ দাবি তুলেছে ।

জাতীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ: দেশভিত্তিক চিত্র

পাকিস্তান: আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম প্রধান দেশ। পাকিস্তানে আনুমানিক ২-৫ মিলিয়ন আহমদিয়া বসবাস করে, যা বিশ্বে আহমদিয়াদের বৃহত্তম জনসংখ্যা । ১৯৭৪ সালে সাংবিধানিকভাবে অমুসলিম ঘোষণার পর থেকে তাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

ব্লাসফেমি আইনের ব্যবহার: আহমদিয়ারা ব্লাসফেমি আইনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। ২০২৩ সালে ব্লাসফেমির অভিযোগে অভিযুক্ত ৩২৯ জনের মধ্যে ২০% (৬৫ জন) ছিলেন আহমদিয়া, এবং আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে ১৯টি নতুন মামলা নথিভুক্ত করা হয় । অনেক ক্ষেত্রে, অভিযুক্তরা বছরের পর বছর বিচারপূর্ব আটকাদেশে থাকেন ।

ইন্দোনেশিয়া: ২০০৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় আহমদিয়া সদস্যদের ধর্ম প্রচারের উপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই ডিক্রি আহমদিয়াদের তাদের বিশ্বাস প্রচার নিষিদ্ধ করে । এর ফলে আহমদিয়াদের লিফলেট বিতরণ, তাদের কার্যালয় ও উপাসনালয়ের সামনে সাইনবোর্ড লাগানো এবং আহমদিয়া সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করে এমন পোশাক পরা নিষিদ্ধ করা হয় ।

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়ার রাজ্য কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে সেলাঙ্গর ইসলামিক ধর্মীয় পরিষদ, ১৯৭৫ সাল থেকে আহমদিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছে। সেলাঙ্গর ফতোয়া কাউন্সিল আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করে একটি ফতোয়া

জারি করে, যা ৭টি রাজ্য এবং ফেডারেল টেরিটরি দ্বারা সমর্থিত । ২০০৯ সালের এপ্রিলে সেলাঙ্গরে আহমদিয়াদের তাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ে নিষেধ করা হয়, যা অমান্য করলে কারাদণ্ড বা জরিমানার বিধান রয়েছে ।

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ফতোয়া আহমদিয়াদের প্রতি বিরোধিতা কেবল জাতীয় সীমানায় আবদ্ধ থাকেনি, বরং আন্তর্জাতিক মুসলিম সংস্থাগুলোও তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে, যা তাদের বিশ্বব্যাপী অবস্থানকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (Organization of Islamic Cooperation - OIC) একটি আন্তঃসরকার সংস্থা, যা ৫৭টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ নিয়ে গঠিত এবং 'মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর' হিসেবে নিজেদের দাবি করে । এই সংস্থাটি মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রচারে কাজ করে । একইভাবে, বিশ্ব মুসলিম লীগ (Muslim World League - MWL) সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক বেসরকারি সংস্থা, যা ইসলামের 'প্রকৃত বার্তা' প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে ।

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে বিশ্ব মুসলিম লীগ একটি ফতোয়া জারি করে, যেখানে আহমদিয়া আন্দোলনকে 'অমুসলিম' হিসেবে ঘোষণা করা হয় । এই ফতোয়ায় আহমদিয়াদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার এবং তাদের একটি অমুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করার জন্য মুসলিম সরকারগুলোর প্রতি 'জরুরি আহ্বান' জানানো হয় । এই ফতোয়াটি পাকিস্তানের ১৯৭৪ সালের সাংবিধানিক সংশোধনীর উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল, যা আহমদিয়াদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে । এই আন্তর্জাতিক ফতোয়াটি আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে একটি বৃহত্তর মুসলিম ঐকমত্যের রূপ দেয়, যা বিভিন্ন দেশে তাদের প্রতিরোধে প্রদানে ব্যবহৃত হয়।

এই আন্তর্জাতিক ফতোয়া এবং রাষ্ট্রীয় ঘোষণার ফলস্বরূপ, আহমদিয়ারা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিভিন্ন বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো সৌদি আরবে হজ পালনে নিষেধাজ্ঞা। আহমদিয়াদের জন্য পুরো সৌদি আরবে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যদি কেউ গোপনে হজ পালনের চেষ্টা করে, তবে তাকে আটক করা হয় । এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ফতোয়া এবং তাদের সদস্য দেশগুলোর নীতি আহমদিয়াদের বৈশ্বিক অবস্থানকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। আহমদিয়া জামাতের বৈশ্বিক বিস্তার ও সামাজিক কার্যক্রম আহমদিয়া মুসলিম জামাত তাদের প্রতি তীব্র বিরোধিতা ও নিপীড়ন সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করেছে এবং একটি সুসংগঠিত সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের বর্তমান বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র লন্ডনে অবস্থিত, যেখান থেকে পঞ্চম খলিফা মির্জা মাসরুর আহমদ এই সংগঠনের কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন । আহমদিয়া জামাত বর্তমানে পৃথিবীর ২১৩টি দেশে সক্রিয় রয়েছে । তাদের ধর্ম প্রচার কার্যক্রম অত্যন্ত জোরালো এবং

সুসংগঠিত। ১৯১৩ সালের দিকেই তারা বিদেশে তাদের প্রচার কাজ শুরু করে, যার একটি উদাহরণ হলো লন্ডনে ফজল মসজিদ নির্মাণ । আহমদিয়া সম্প্রদায় ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় প্রচুর প্রকাশনা নিয়ে কাজ করে এবং তাদের সদস্যরা ধর্ম প্রচারে অত্যন্ত আগ্রহী । তারা কেবল ধর্মীয় প্রচারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মূলমন্ত্র হলো "সকলের জন্য ভালোবাসা, কারো জন্য ঘৃণা নয়" (Love for All, Hatred for None) । এই স্লোগান তাদের শান্তি, সংহতি, এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে । তারা শিক্ষা, সংহতি এবং আন্তঃধর্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে এবং তাদের মসজিদগুলো সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখে, যার লক্ষ্য হলো মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া ও বিশ্বাস তৈরি করা । তারা নিয়মিত শান্তি সম্মেলন (peace symposiums) আয়োজন করে এবং MTA ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি বিনামূল্যে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট চ্যানেল পরিচালনা করে, যা সকল ধর্ম ও পটভূমির মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ছড়িয়ে দিতে নিবেদিত । আহমদিয়া সম্প্রদায় তাদের কার্যক্রমের জন্য কোনো দেশ, সরকার বা সংস্থা থেকে অর্থায়ন গ্রহণ করে না। তারা সম্পূর্ণভাবে আত্ম-অর্থায়ন করে, যেখানে সদস্যরা স্বেচ্ছায় তাদের সময় ও অর্থ দান করেন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন দাতব্য ও মানবিক কার্যক্রমের জন্য । তাদের এই মানবিক প্রচেষ্টা বিশ্বজুড়ে, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও, অভাবী মানুষের জন্য পরিচালিত হয়, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে । আফ্রিকা মহাদেশে আহমদিয়া জামাতের একটি বিশাল প্রভাব রয়েছে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এটি "আফ্রিকান-আমেরিকান ইসলামে তর্কসাপেক্ষে সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্প্রদায়" হিসেবে বিবেচিত ছিল । তাদের এই বৈশ্বিক বিস্তার, সুসংগঠিত নেতৃত্ব এবং মানবিক কার্যক্রম তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্থিতিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিপীড়ন সত্ত্বেও, তারা তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায় গড়ে তোলার এবং শান্তি ও সম্প্রীতি প্রচারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।ভারতীয় উপমহাদেশে কাদিয়ানী মতবাদের আবির্ভাব ও প্রসারে আহলেহাদীছ আলেমগণ অত্যন্ত জোরালো এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ইংরেজ শাসনের সময় কাদিয়ানী মতবাদ একটি বিশাল ফিতনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যা মুসলিম উম্মাহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই ফিতনাকে দমন করার জন্য আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম সর্বপ্রথম ময়দানে অবতীর্ণ হন।

আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা ও অবদান:

- কুফরীর প্রথম ফতোয়া: মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যখন নিজেকে নবী দাবি করেন, তখন সর্বপ্রথম যে আলেমে দ্বীন তার বিরুদ্ধে কুফরীর ফতোয়া লিপিবদ্ধ করেন, তিনি ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী। তিনি এই ফতোয়া তার উস্তাদ মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে উপস্থাপন করেন এবং তার স্বাক্ষর নেন। এরপর তিনি নিজে বা প্রতিনিধি পাঠিয়ে ভারতের দূর-দূরান্তের দু'শ প্রসিদ্ধ আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করে এই ফতোয়া শোনান, এবং তারা তাতে সত্যায়নমূলক স্বাক্ষর ও সিলমোহর দেন। এই ফতোয়া কাদিয়ানীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।
- বাহাছ ও মুনাযারা: আহলেহাদীছ আলেমগণ কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা খণ্ডনে অসংখ্য বাহাছ ও মুনাযারায় অংশ নিয়েছেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাকে "ইমামু আক্বীদাতিল ইসলাম" বলা হয়। ভারতের মাটিতে এমন কোনো ভ্রান্ত আক্বীদা ছিল না, যার বিরুদ্ধে তিনি মুনাযারা, বাহাছ করেননি। তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্ক ও লেখনী কাদিয়ানীদের ভিত নড়বড়ে করে দেয়।
- গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা: আহলেহাদীছ আলেমগণ কাদিয়ানী মতবাদের ভ্রান্তি উন্মোচন করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন:
  - মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী: তার প্রায় ১০টির কাছাকাছি গ্রন্থ রয়েছে শুধু আক্বীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর।
  - আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর: কাদিয়ানী ও শিয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে তার কলম ও মুখ ছিল দুধারী তলোয়ারের মতো। তার ইলমী রাদ্দ বাতিলপন্থীদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে।
  - মাওলানা মুহাম্মাদ মুকতাদা আছারী উমরী: তিনি 'তাযকিরাতুল মুনাযিরীন' শীর্ষক দুই খণ্ডে গ্রন্থ লিখেছেন, যেখানে ভারত ভাগের পূর্ব ও পরের আহলেহাদীছ আলেমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাদের মুবাহালা ও বাহাছ-মুনাযারার বিবরণী পেশ করা হয়েছে।
- সাংবাদিকতার মাধ্যমে প্রচার: আহলেহাদীছ আলেমগণ সাংবাদিকতার মাধ্যমেও কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। শায়খুল ইসলাম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ.)-এর 'আখবারে আহলেহাদীছ' পত্রিকা কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপমহাদেশে কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আলেমগণের এই ধারাবাহিক সংগ্রাম ও অবদান মুসলিম উম্মাহকে এই ফিতনা থেকে রক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা রেখেছে। তাদের

ইলমী, দা'ওয়াতী এবং বাহাছ-মুনাযারার মাধ্যমে কাদিয়ানীদের মিথ্যাচার উন্মোচিত হয়েছে এবং মুসলিম সমাজকে সঠিক আক্বীদার পথে পরিচালিত করেছে।

দেওবন্দী আলেমদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা:

ভারতীয় উপমহাদেশে কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেওবন্দী আলেম সমাজের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাদিয়ানী মতবাদ যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন দারুল উলুম দেওবন্দ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত আলেমগণ এই ফিতনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করতে জোরালো ভূমিকা পালন করেন।

- প্রাথমিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি: মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যখন নিজেকে 'মাসীহে মাওউদ' (প্রতিশ্রুত মাসীহ) এবং পরবর্তীতে 'মাহদী' দাবি করেন, তখন থেকেই দেওবন্দের আকাবিরগণ এই ফিতনার বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করতে শুরু করেন। তাদের প্রখর ঈমানী বসীরত এবং ইসলামের সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকায় তারা খুব দ্রুতই এই ভ্রান্ত মতবাদের বিপদ উপলব্ধি করতে পারেন।
- কুফরীর ফতোয়া: ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে লুধিয়ানার আলেমগণ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া দেন। এরপর, ১৯৭৪ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাদিয়ানীদের কাফের ঘোষণা করা হয়। এছাড়া, রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলনে ১৪৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের সংগঠন কাদিয়ানীদের সর্বসম্মতভাবে কাফের ঘোষণা করে, যেখানে দেওবন্দী আলেমদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
- লেখনী ও প্রকাশনা: দেওবন্দী আলেমগণ কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তারা কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আকীদা, বিশেষ করে খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি নিয়ে তাদের বিকৃতি এবং জিহাদ সম্পর্কিত ভুল ধারণাকে খণ্ডন করেছেন। এই লেখনীগুলো মুসলিম উম্মাহকে কাদিয়ানীদের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষায় সহায়ক হয়েছে।
- মুনাযারা ও বাহাছ: আহলেহাদীছ আলেমদের পাশাপাশি দেওবন্দী আলেমগণও কাদিয়ানীদের সাথে বহু বাহাছ ও মুনাযারায় অংশ নিয়েছেন। এসব বিতর্ক কাদিয়ানীদের যুক্তির দুর্বলতা এবং তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করেছে।
- খতমে নবুওয়াত আন্দোলন: দেওবন্দী আলেমগণ খতমে নবুওয়াত (নবুওয়াতের সমাপ্তি) বিষয়ে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়টি কাদিয়ানীদের মূল ভ্রান্ত আকীদা, কারণ তারা মির্যা গোলাম আহমাদকে নবী মানে, যা ইসলামের মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী। দেওবন্দী আলেমগণ এই মৌলিক বিশ্বাসের সুরক্ষায় অবিচল ছিলেন।

- জনসচেতনতা সৃষ্টি: দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন সময়ে জনসভায়, ওয়াজ মাহফিলে এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কাদিয়ানী ফিতনার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছেন। তারা মুসলিমদের ঈমান রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

সলামে খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের সমাপ্তি একটি মৌলিক আকীদা (বিশ্বাস)। এর অর্থ হলো, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন নবী আসবেন না। কাদিয়ানী মতবাদের মতো যেসব ভ্রান্ত ফেরকা নিজেদের নবী দাবি করে, তারা এই মৌলিক আকীদার বিরোধিতা করে, যা তাদের ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

আপনি যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো এই আকীদার স্পষ্ট প্রমাণ। নিচে হাদীসগুলো এবং তাদের তাৎপর্য আলোচনা করা হলো:

১. হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের প্রত্যেকে নবী বলে দাবী করবে। জেনে রেখ, আমি হলাম খাতামুন্নাবিয়ীন, আমার পরে আর কোন নবী নেই।" (সুনানে তিরমিযী ২/৪৫; মুসনাদে আহমদ ৬/৩৭৩ হা. ২১৮৮৯)

তাৎপর্য: এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নবী কারীম (সা.) শেষ নবী। তাঁর পরে যারা নবুওয়াতের দাবি করবে, তারা সবাই মিথ্যাবাদী হবে। এই হাদীসটি কাদিয়ানীদের মতো মিথ্যা নবীর দাবিদারদের দাবির অসারতা প্রমাণ করে।

২. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস (হাদীসে মানযিলা):

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা.)-কে বললেন, "মুসার পক্ষ থেকে হারুন যে দায়িত্ব, মর্যাদা, আর সম্পর্কের স্থানে ছিলেন আমার পক্ষ থেকে তুমি হলে সেই স্থানে, তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে কোন নবী নেই।" (সহীহ বুখারী ২/৬৩৩; সহীহ মুসলিম ২/২৭৮; সুনানে তিরমিযী ২/২১৩)

তাৎপর্য: তাবুক যুদ্ধে আলী (রা.)-কে মদিনায় স্থলাভিষিক্ত করার সময় নবী (সা.) এই কথা বলেছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, হারুন (আ.) যেমন মূসা (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েও নবী ছিলেন, আলী (রা.) সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেও তাঁর পরে কোনো নবী নেই। এই হাদীসটি সরাসরি খতমে নবুওয়াতের প্রমাণ।

৩. যুবায়ের ইবনে মুত্বয়িম (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস:

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমদ, আমি মাহী, অর্থাৎ আমার মাধ্যমে কুফরী বিমোচিত হবে; আমি হাশির, আমার (যুগের) পরই মানুষকে হাশরের মাঠে একত্র করা হবে এবং আমি হলাম আ'কিব অর্থাৎ যার পরে আর কোন নবী নেই।" (সহীহ বুখারী ১/৫০০, ২/৭২৭; সহীহ মুসলিম ২/২৬১; সুনানে তিরমিযী ২/১১১)

তাৎপর্য: এখানে নবী (সা.) নিজেকে 'আ'কিব' হিসেবে পরিচয় করিয়েছেন, যার অর্থ হলো, "যাঁর পরে আর কোনো নবী নেই।" এটি তাঁর নবুওয়াতের চূড়ান্ততা ও সমাপ্তিকেই বোঝায়।

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত দৃষ্টান্তমূলক হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি একটি সুরম্য গৃহ নির্মাণ করল তবে এক কোণে একটি মাত্র ইটের স্থান শূন্য রাখল। লোকেরা গৃহটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এবং তার সৌন্দর্যে চমৎকৃত হতে লাগল। তবে ওই কোণটি দেখে তারা বলতে লাগল, 'এই ইটটি কেন বসানো হয়নি?' দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই হলাম সেই ইট এবং আমি হলাম খাতামুন্নাবিয়ীন।" (সহীহ বুখারী ১/৫০১; সহীহ মুসলিম ২/২৪৮)

৫. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত অনুরূপ হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করল এবং নির্মাণ কাজ সুচারুরূপে সমাপ্ত করল, তবে একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে দিল। এবার লোকেরা তাতে প্রবেশ করল এবং তার নির্মাণ কুশলে চমৎকৃত হল। কিন্তু ওই শূন্য-স্থানটি দেখে বলতে লাগল, 'এই একটি মাত্র ইটের স্থান যদি শূন্য না থাকত!' এই দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি হলাম সেই শূন্য-স্থানের ইট। আমি প্রেরিত হলাম এবং নবী আগমনের ধারা সমাপ্ত হল।" (সহীহ মুসলিম ২/২৪৮)

তাৎপর্য: এই হাদীস দুটি দ্বারা নবী (সা.) খুব সুন্দরভাবে খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি হলেন সেই শেষ ইট, যা দিয়ে নবুওয়াতের ইমারত পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে নবুওয়াতের ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

এই হাদীসগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। কাদিয়ানীদের মতো যারা নবুওয়াতের দাবি করে, তারা এই সুস্পষ্ট হাদীস এবং কুরআনের আয়াতের (যেমন: সূরা আহযাব, আয়াত ৪০) সরাসরি বিরোধিতা করে এবং মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকীদার পরিপন্থী কাজ করে। এই আকীদা ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী (দা.বা.) খতমে নবুওয়াত বিষয়ে আলোচনা

গত ১৯ রজব ১৪৪০ হিজরী (২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ) বুধবার ঢাকার খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করে। সেই সম্মেলনে দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত মুহতামিম হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী (দা.বা.) খতমে নবুওয়াত বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। বাংলাভাষী পাঠকদের সুবিধার জন্য তাঁর উর্দু আলোচনার কিছু ব্যাখ্যা ও পরিমার্জনসহ অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হলো।

আল্লাহর প্রশংসা ও দরূদ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই, তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনি এবং তাঁর ওপর ভরসা করি। আমরা আমাদের নফসের অকল্যাণ এবং মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

আলোচনার প্রারম্ভিকা: আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: "মাকানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মীর রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যীন।" (সূরা আহযাব: ৪০) অর্থাৎ: "মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।"

আর নবী (সা.) বলেছেন: "আনা খাতামুন নাবিয়্যীনা লা নাবিয়্যা বা'দী।" অর্থাৎ: "আমিই শেষ নবী, আমার পর কোনো নবী নেই।"

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

আজকের এই সমাবেশ 'খতমে নবুওয়াত' শিরোনামে আয়োজন করা হয়েছে। আমি আপনাদের সামনে খতমে নবুওয়াতের অর্থ এবং 'তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত' (খতমে নবুওয়াতের সুরক্ষা)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করব। খতমে নবুওয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের যে পবিত্র ধারা শুরু করেছেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের মাধ্যমে সেই ধারাকে সমাপ্ত করেছেন।

কালিমার দুটি অংশ ও তার তাৎপর্য

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা যে কালিমা পড়ি, তার দুটি অংশ।

প্রথম অংশ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ অর্থাৎ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।"

এই অংশে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের আলোচনা রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, এই স্বীকারোক্তি দেওয়া যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের দিক থেকে, গুণাবলীর দিক থেকে, সৃষ্টি ও রিযিক দানের দিক থেকে, ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিক থেকে—অর্থাৎ সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। সৃষ্টিজগতের সকলেই তাঁর বান্দা ও দাস। আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্বের ক্ষেত্রে যে কোনোভাবে যে কাউকে শরীক করা শিরক। এর মাধ্যমে মানুষ ঈমান ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

কেউ যদি বলে, আল্লাহ তায়ালাই প্রভু, কিন্তু তিনি তাঁর প্রভুত্বের সামান্য অংশ অন্যকে দান করেছেন; কিংবা এ বিশ্বাস করে যে, প্রকৃত খোদা তো আল্লাহ তায়ালাই, তবে অমুক ব্যক্তি 'ছায়া-খোদা'—তবে এমন বিশ্বাসও শিরক। আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়াত ও প্রভুত্বে এক অণু পরিমাণও অন্য কাউকে কোনোভাবে শরীক করা তাওহীদ ও আল্লাহর একত্ববাদ অস্বীকার করার নামান্তর। এর মাধ্যমে মানুষ ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অংশ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ অর্থাৎ: "আমি (মন থেকে) এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার রাসূল।"

এই অংশের উদ্দেশ্য হলো, একথার স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য দেওয়া যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার রাসূল। ঠিক সে পরিমাণ মজবুতি ও গুরুত্বের সাথে, সে পরিমাণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে একথারও সাক্ষ্য দেওয়া যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সর্বশেষ নবী।

কারণ, তাঁর শেষ নবী হওয়ার বিষয়টি হাদীস শরীফে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদেও দ্ব্যর্থহীনভাবে তা বলা হয়েছে। কাজেই তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকার করার পর তাঁর শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তাঁর পর কেউ নবী হতে পারবে না; কিয়ামত পর্যন্ত আর কেউ নবী হিসেবে আগমন করবে না। হ্যাঁ, হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের পূর্বে এ পৃথিবীতে আবার আগমন করবেন, কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর নবুওয়াত লাভ করেননি; তাঁকে তো নবী অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। শেষ যামানায় তিনি এ পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন। পৃথিবীতে আগমন করে তিনি নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর শরীয়তের আহকাম ও বিধি-বিধান জারি করবেন।

যাইহোক, আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়াত এবং প্রভুত্বের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করা যেমন শিরক, তা যে কোনো ব্যাখ্যা বা অর্থেই হোক না কেন, এর কারণে তার তাওহীদের

বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় এবং সে মুশরিক সাব্যস্ত হয়। তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর যেকোনো ধরনের ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে 'যিল্লী নবী' (ছায়া নবী), 'বুরুযী নবী' বা 'মাজহার' (প্রকাশ)-এর নামে কাউকে নবী মনে করা—এটা স্পষ্ট কুফর। যে কোনো ধরনের ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েই এমন করে থাকুক, তার খতমে নবুওয়াতের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাফের সাব্যস্ত হবে।

কাদিয়ানীদের প্রতারণা ও তাদের কুফরী আকীদা

কাদিয়ানীরা খুব জোরালো কণ্ঠে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কালিমা পড়ে। তাদের গাড়ি-বাড়ি এবং সবকিছুর মধ্যে খুব বড় করে কালিমা লিখে রাখে, যেন সাধারণ মুসলমানরা ধোঁকা খায় যে, এরাও তো আমাদের মতোই কালিমা পড়ে এবং নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে রাসূল হিসেবে মানে। কিন্তু আমার ভাইয়েরা! এটা সম্পূর্ণ ধোঁকা ও প্রতারণা।

মুহাম্মাদ (সা.)-কে রাসূল হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার পর কোনো ব্যক্তি যদি গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বা অন্য কাউকে আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবী মনে করে, চাই যে অর্থেই নবী মনে করুক না কেন, তাহলে সে মূলত মুহাম্মাদ (সা.)-কে রাসূল হিসেবে অস্বীকার করছে। প্রভুত্বের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও কেউ যদি মুখ দিয়ে কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে, তাকে যেমন কাফের বলা হবে, তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য যে, তাঁকে আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী স্বীকার করার পর তাঁর পরের কোনো ব্যক্তিকে যদি কেউ নবী মেনে নেয়—তা যে কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েই হোক না কেন, সে যতই মুখে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলুক না কেন—তাকে কাফের বলা হবে।

নবীজি (সা.)-এর ওপর ঈমান আনার সর্বপ্রথম দাবি হলো, নবীজিকে সত্য মনে করা এবং তিনি যা কিছু বলেছেন, সবকিছুর ক্ষেত্রে তাঁকে সত্যবাদী মনে করা। সুতরাং তিনি যে বলেছেন—"আনা খাতামুন নাবিয়্যীন" অর্থাৎ 'আমিই শেষনবী'—একথাও সত্য মনে করে মেনে নেওয়া।

একারণেই কেউ নবুওয়াতের দাবি করলে তার থেকে এর দলীল-প্রমাণ জানতে চাওয়াও মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার নামান্তর। কেউ যদি দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেয় যে, 'আমি প্রভু, আমি আল্লাহ;' তাহলে আপনারা কেউ কি তার দাবির পক্ষে দলীল-প্রমাণ জানতে চাইবেন যে, তুমি প্রভু হওয়ার দলীল কী? কেউ জানতে চাইবে না। কেন? কারণ, আপনার এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ একজন। তিনি ব্যতীত আর কেউ প্রভু হতে পারে না, ইলাহ হতে পারে না, মাবুদ হতে পারে না। তাই এ ব্যক্তি যতই

প্রলাপ বকুক না কেন, এর দ্বারা আমাদের বিশ্বাসে সামান্য চিড় ধরবে না। আমাদের ঈমানে সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি হবে না। এমনকি আমরা তার কাছ থেকে কোনো দলীল-প্রমাণও শুনতে চাইব না। ঠিক তেমনিভাবে কেউ যদি নবীজি (সা.)-এর পর নবুওয়াতের দাবি করে, তা যে শিরোনামেই করুক—'যিল্লী' শিরোনামে হোক বা 'বুরূজী' শিরোনামে—এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের জন্য এটা জায়েয নয় যে, আমরা তার কাছে জানতে চাইব—তোমার নবুওয়াতের পক্ষে দলীল কী? কারণ, তার মিথ্যাবাদী হওয়া তো এমনিতেই স্পষ্ট।

পৃথিবীর সমস্ত উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে ব্যক্তি গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বা রাসূল মনে করবে, তা সে যে অর্থেই মনে করুক, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

মুনাফিকদের উদাহরণ ও শিক্ষার্জন

প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা সূরা মুনাফিকূনের এই আয়াত পড়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: "ইযা জাআকাল মুনাফিকূনা ক্বালু নাশহাদু ইন্নাকা লা রাসূলুল্লাহি, ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু ইন্নাকা লা রাসূলাহু, ওয়াল্লাহু ইয়াশহাদু ইন্নাল মুনাফিকীনা লাকাযিবুন।" (সূরা মুনাফিকূন: ১) অর্থাৎ: "মুনাফিকরা যখন আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। (এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন,) আল্লাহ জানেন, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"

মুনাফিকরা মুখে বলছে, "আমরা মন থেকে আপনাকে রাসূল হিসাবে স্বীকার করে নিচ্ছি;" কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, এরা মিথ্যা বলছে; এরা ধোঁকা দেওয়ার জন্য শুধু মৌখিকভাবে কালেমা পড়ছে। মন থেকে তা স্বীকার করছে না। রাসূলের যামানায় যেসকল মুনাফিক ছিল, তারাও রিসালাতের শ্লোগান দিত, তাওহীদের শ্লোগান দিত। কিন্তু কুরআন তাদের ব্যাপারে কী ঘোষণা দিচ্ছে? কুরআন বলছে—মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে।

এজন্য ভাইয়েরা আমার! মুসলমান হওয়ার জন্য কেবল মৌখিকভাবে কালিমা পড়া যথেষ্ট নয়। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে যেমন অন্য কাউকে শরীক করার অবকাশ নেই। কেউ এমন করলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ঠিক তেমনিভাবে কেউ যদি নবীজি (সা.)-এর শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করে, অন্য কাউকে নবী বলার চেষ্টা করে—সেও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

দেওবন্দী আকাবিরদের ভূমিকা ও আন্তর্জাতিক ঐক্যমত

তাহলে এই বিষয়টা নিয়ে কি আমাদের ভাবতে হবে না? আলহামদু লিল্লাহ, কাদিয়ানী ফিতনার শুরুর দিকেই আকাবিরে দেওবন্দ জনসাধারণকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যখন প্রথমে মাসীহে মাওউদ (প্রতিশ্রুত মাসীহ) হওয়ার দাবি করল, এরপর মাহদী হওয়ার দাবি করল—আল্লাহ তায়ালা আমাদের আকাবিরগণের কবরকে নূর দিয়ে ভরপুর করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে এমন ঈমানী বসীরত এবং ইসলামের ব্যাপারে এমন সূক্ষ্ম অনুভূতি দান করেছেন যে, শুধু ঘ্রাণ শুনেও তারা উপলব্ধি করতে পারতেন যে, এখানে সমস্যা লুকিয়ে আছে। তখন উলামায়ে কেরাম মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে ঈমানের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেন এবং জনসাধারণকে এ ফিতনার বিষয়ে সতর্ক করেন।

পরবর্তীতে যখন ধীরে ধীরে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়াত দাবির বিষয়সহ অন্যান্য কুফরী আকীদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন সবাই সচেতন হয়ে যায় যে, উলামায়ে কেরাম যা বলেছেন, সেটাই সঠিক; নিঃসন্দেহে সে ইসলাম থেকে খারিজ। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান-বাংলাদেশ ও আশপাশের দেশ, যেমন আফগানিস্তান, বার্মা ইত্যাদি দেশের উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে মির্যা কাদিয়ানী কাফের হওয়ার সিদ্ধান্ত দেন।

সৌদি আরবে রাবেতাতুল আলামীল ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সারা বিশ্বের বড় বড় উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। সেখানে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী সকল মাযহাবের বড় বড় উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। তারাও সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদেরকে কাফের হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, বরং সারা বিশ্বের সকল আলেম ও সকল মুফতী, সে যে ফেরকারই হোক না কেন বা যে মাযহাবেরই অনুসারী হোক না কেন—কাদিয়ানীদের অমুসলিম হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। এতে না আছে কোনো ভিন্নমত, না আছে কোনো দ্বিধা-সংশয়।

ভাওয়ালপুর আদালতের ঐতিহাসিক রায় ও আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.)-এর অবদান

আপনারা আপনাদের উলামায়ে কেরামের কাছে হয়তো শুনেছেন যে, একবার এক মহিলা ভাওয়ালপুর আদালতে মামলা দায়ের করে যে, তার স্বামী কাদিয়ানী হয়ে গেছে; ফলে সে কাফের হয়ে গেছে। সুতরাং বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া হোক। তখন কাদিয়ানীরা চেষ্টা করছিল, তাদেরকে যেন মুসলমান হিসেবে মেনে নেওয়া হয় এবং বিবাহ বহাল থাকে।

তখন ছিল ইংরেজদের শাসনামল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগের ঘটনা। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) ছিলেন একজন জীবন্ত কুতুবখানা। চব্বিশ ঘণ্টা তিনি কিতাব নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। পড়া ও পড়ানোই তাঁর মূল কাজ। কোথাও কোনো জলসা-সেমিনার ইত্যাদিতে যেতেন না। তাঁর সমস্ত জীবনজুড়ে ছিল শুধু কিতাব আর দরস-তাদরীস। যখন তাঁর কাছে

এই সংবাদ পৌঁছল—আদালতে এই মামলার শুনানি চলছে এবং বিষয়টি এত স্পর্শকাতর ছিল যে, —আল্লাহ না করুন— আদালত যদি এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, কাদিয়ানিরা মুসলমান; তাহলে মুসলমানদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) বুখারী শরীফ পড়াতেন। তিনি দরস বন্ধ করে নিজের সাথে কিছু ছাত্র নিয়ে দেওবন্দ থেকে ভাওয়ালপুর যান। সেখানে কিছুদিন থেকে আদালতে শক্তিশালী আলোচনা পেশ করেন। আদালতেও কাদিয়ানীরা একবার ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমার উস্তাযগণের মুখে শুনেছি, কাদিয়ানী উকিল একবার 'ফাওয়াতিহুর রহমূত শরহু মুসাল্লামিস সুবূত' কিতাব থেকে একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনিয়ে বলে, দেখো এটা তো হানাফীদের কিতাব, তার মধ্যে ইবারত লেখা আছে এবং এ ইবারত দ্বারা আমাদের আকীদা প্রমাণিত হয়। আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) তখন জজ সাহেবকে বললেন, জজ সাহেব! কিছু কিতাব তো আমরাও পড়েছি। এ মুহূর্তে আমার কাছে 'ফাওয়াতিহুর রহমূত শরহু মুসাল্লামিস সুবূত' কিতাবটি নেই। তবে ৪০ বছর আগে আমি এ কিতাব পড়েছিলাম। সে আলোকে বলছি, আমার বিবাদী যে উদ্ধৃতি পড়ছে, এতে কিছু লুকোচুরি করছে। মাঝখানে মাঝখানে বাদ দিয়ে আগেপিছে থেকে পড়ছে। আমার কাছে কিতাব পেশ করা হোক। জজ তখন কিতাব চেয়ে পাঠান। কাশ্মীরী (রহ.)-এর সামনে কিতাব পেশ করা হলে তিনি পুরো ইবারত দেখে বললেন, এই ব্যক্তি সবাইকে ধোঁকা দিচ্ছে। সে মাঝখান মাঝখান থেকে কিছু কিছু বাদ দিয়ে পড়ছে। জজ তখন বিষয়টি দেখলেন এবং তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এরা ধোঁকাবাজ!

মামলার কার্যক্রম শেষে আদালত এই রায় দেয় যে, কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তিটি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। সুতরাং মুসলিম মেয়েটি বিবাহ ভঙ্গের যে দাবি করেছে, তা সঠিক। অবশেষে আদালতের সিদ্ধান্তে সে বিবাহ বাতিল বলে ঘোষণা দেওয়া হয় এবং কাদিয়ানীরা অমুসলিম বলে রায় প্রদান করা হয়।

কাশ্মীরী (রহ.)-এর এই ভূমিকার পর আল্লাহর রহমতে কাদিয়ানী ফিতনা অনেকাংশে দমে যায়। ভারত ভাগের পর কাদিয়ানীরা পাকিস্তান চলে যায়। সেখানে তারা রাবওয়া নামক এলাকা আবাদ করে এবং সমস্ত কাদিয়ানীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকে আবার পুরোদমে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়।

তখন পাকিস্তানে যেসকল আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ ছিলেন—আল্লামা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, মনযূর আহমদ চিন্নৌটি, ইউসুফ বিন্নুরী, মুফতি শফী দেওবন্দী, মাওলানা আব্দুল হক, মাওলানা গোলাম রসূল খান—তারাও সেই কাজ শুরু করেন, যা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) করেছিলেন। এরা সবাই দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন কিংবা দেওবন্দের ফয়েযধন্য ছিলেন। খানকা ছেড়ে তারাও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উলামায়ে কেরামের তীব্র আন্দোলনের ফলে অবশেষে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট থেকে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা

দেওয়া হয়; যেমন আপনাদের দেশে যেসকল অমুসলিম আছে, তাদেরকে সংখ্যালঘু স্বীকৃতি দেওয়া হয়। হিন্দুস্তানেও যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি, সেখানে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইসলাম ও হিন্দু আলাদা ধর্ম। আপনাদের এখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর হিন্দুরা সংখ্যালঘু। হিন্দুস্তানে এর উল্টা; হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর মুসলমানরা সংখ্যালঘু। কিন্তু এটা তো হতে পারে না যে, একজন মানুষ মুসলমান হবে আবার হিন্দুও থাকবে। তেমনি এটাও সম্ভব নয় যে, একজন মানুষ কাদিয়ানী হবে আবার মুসলমানও থাকবে।

অনেকদিন পর্যন্ত এ ফেতনা একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ ছিল কিন্তু যেহেতু তাদের ওপর পশ্চিমা শক্তির সাহায্য ও সমর্থন ছিল এবং পশ্চিমারাই খতমে নবুওতের বিরুদ্ধে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে বীজরূপে বপন করেছিল, ফলে তাদের ধন-সম্পদের সীমা-পরিসীমা নেই।

প্রত্যেক কাদিয়ানীর জন্য নিজের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ তাদের ধর্মীয় ফান্ডে জমা দেওয়া আবশ্যক। তারা নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের জন্য সেসকল অঞ্চলকেই বেছে নেয়, যেখানকার মুসলমানরা দরিদ্র এবং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। কখনো সম্পদের লোভ দেখিয়ে, কখনো সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলে, কখনো চাকরি দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে, কখনো মেয়ের বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে, কখনো নগদ অর্থ দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের তাদের শিকারে পরিণত করে চলেছে। যেসকল মুসলিম শিশু তাদের চক্রান্তের শিকার হয়, তাদের ব্যাপারে তারা বলে, আমরা তাদেরকে শিক্ষিত করে আবার আপনাদের কাছে ফিরিয়ে দিব। অবশেষে তাদেরকে কাদিয়ানী বানিয়ে ফেলে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! যখন এই ফেতনা ব্যাপক হতে লাগল, তখন দারুল উলূম দেওবন্দে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করা হলো।

তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত: আমাদের করণীয়

এতক্ষণ খতমে নবুওয়াত নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত—তথা কীভাবে খতমে নবুওয়াত-এর সংরক্ষণ করব—এ সংক্রান্ত আলোচনা করব। প্রিয় ভাইয়েরা! এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? প্রথম কথা তো হলো, আমাদের অনেক ভাই জানে না যে, আকীদায়ে খতমে নবুওয়াত কী? এর অর্থ কী? এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? মনে করে, মুসলমানদের মধ্যে যেমন অনেক দল আছে, বেরেলবী, মওদুদী, আহলে হাদীস; এদের সবার মাঝে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও এরা সবাই মুসলমান। এমনিভাবে কাদিয়ানীরাও মুসলমানদের একটি দল। আর আশ্চর্য ব্যাপার হলো, মুসলিমদের যত দল আছে, কেউ তাদের নামের সাথে 'মুসলিম' শব্দটি যোগ করে না, কেউ বলে না—দেওবন্দী মুসলিম, বেরেলবী মুসলিম, সালাফী মুসলিম। কারো এই শব্দ বলার প্রয়োজন পড়ে না। তাহলে কাদিয়ানীদের নামের মধ্যে কেন ('আহমদীয়া মুসলিম জামাত') 'মুসলিম' টাইটেল লাগানোর প্রয়োজন পড়ল? আসল কথা হলো, এরা প্রতারক। নইলে নিজেদেরকে আহমদিয়া 'মুসলিম' জামাত বলার কী প্রয়োজন!

মুসলিমদের মাঝে অনেক বড় বড় ফেরকা তৈরি হয়েছে। যেমন—খাওয়ারেজ, মুতাযেলা, জাহমিয়া, মুরজিয়া। দৃষ্টিভঙ্গি ও আকিদাগত মতপার্থক্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক যুগেই মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ফেরকা ও দল সৃষ্টি হয়েছে —আমরা তাদের সব বিষয়ের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করি না; বরং ভিন্নমত পোষণ করি— কিন্তু এদের কারোরই নিজেদের নামের সাথে 'মুসলিম' শব্দটি লাগানোর প্রয়োজন হয়নি। কারণ, এরা মুসলমানদেরই বিভিন্ন ফেরকা। সুতরাং কাদিয়ানীদের 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত' নাম ধারণ করাটাই ইঙ্গিত করছে যে, এটি মিথ্যা নাম, যার মাধ্যমে এরা মুসলমানদের কাতারে ঢুকতে চাচ্ছে।

এজন্য সর্বপ্রথম জরুরি কাজ হলো, আজ যেভাবে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে, তেমনি প্রত্যেক এলাকায় মুসলমানদের একত্রিত করে তাদেরকে আকীদায়ে খতমে নবুওয়াত-এর মর্ম ও গুরুত্ব বোঝাতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হলো, বাচ্চাদের দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। যেমনিভাবে নেসাবের মধ্যে নামায-রোযা ও পাক-নাপাকের মাসায়েল শেখানো হয়, প্রাথমিক ছাত্রদেরকে তালীমুল ইসলাম পড়ানো হয়, তেমনি বাচ্চাদেরকেও আকীদার কিছু মৌলিক কিতাব পড়ানো উচিত। এ ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দ-এর পক্ষ থেকে একটি কাজ করা হয়েছে। মাওলানা শাহ আলম ছাহেব, যিনি 'শো'বায়ে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত'-এর শিক্ষক এবং এই শো'বার নায়েবে নাজিম, তিনি 'আকাইদুল ইসলাম' নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং মাওলানা রিয়াসাত আলী ছাহেব, মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী

ছাহেবকে প্রতিটি শব্দ শব্দ দেখিয়ে সম্পাদনা করে এ কিতাব প্রকাশ করেছেন। এ কিতাবটির ব্যাপক প্রচার-প্রসার হওয়া দরকার এবং প্রত্যেক মাদরাসার মক্তবে এবং প্রাথমিক জামাতগুলোতে যেভাবে ছাত্রদেরকে নামায শেখানো হয়, রোযা শেখানো হয়, তেমনি মাহদীর পরিচয়, ঈসা (আ.)-এর পরিচয়, কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশিত নিদর্শনাবলী এবং খতমে নবুওয়াতের অর্থ ও মর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলো শেখাতে হবে। যখন শিশুরা শৈশবেই এ বিষয়গুলো পড়বে, তখন বড় হওয়ার পর এর বিপরীত কোনো কথা কানে পৌঁছলে শৈশবেই যেহেতু এই বিশ্বাস হৃদয়ে গেঁথে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর কোনো নবী আসবে না—তখন সাথে সাথেই সে এই ভ্রান্ত আকীদাকে অস্বীকার করবে এবং এর হাত থেকে বেঁচে যাবে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! তৃতীয় কথা হলো, ঈমান আমাদের সবচেয়ে বড় পুঁজি। ঈমান বাঁচানোর জন্য যত বড় কোরবানী দেওয়ার প্রয়োজন হোক না কেন, মানুষ দিতে প্রস্তুত। দুঃখ, দারিদ্র্য, অসুস্থতা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা সাময়িক ব্যাপার। দুনিয়া থেকে যাওয়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু ঈমান আমাদের সাথে যাবে। আখিরাতে সফলতা ও ব্যর্থতার সবকিছুই ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। তাই—আল্লাহ না করুন—যদি কেউ এ অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, সে পেরেশানীর মধ্যে আছে, অভাব-অনটনে জর্জরিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো পথ তার সামনে খোলা নেই। আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে কোনো ভ্রান্ত ফেরকা—চাই কাদিয়ানী হোক, কিংবা খ্রিস্টান মিশনারী—তাকে লোভ দেখিয়ে ইসলাম ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে, তখন যেন সে ঈমানের ওপর অটল-অবিচল থাকে এবং প্রত্যয়-দীপ্ত কণ্ঠে এ কথা বলতে পারে যে, "জান দিয়ে দেব কিন্তু ঈমান বিক্রি করব না।"

প্রিয় বন্ধুগণ! যেসকল প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা, যেসকল সংগঠন ও উলামায়ে কেরাম তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াতের কাজ করেন এবং এই মেহনত নিয়ে ভাবেন, আমাদের সবাইকে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করতে হবে। তাদের সহমর্মী হতে হবে এবং সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। যখন যেখানে যে ধরনের কাজ ও কোরবানীর প্রয়োজন পড়বে, তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে এবং আগে বেড়ে কোরবানী দিতে হবে। তাহলেই সম্ভব তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত ও আকীদায়ে খতমে নবুওয়াতের সংরক্ষণ।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) যখন ভাওয়ালপুর যান, তখন তিনি বলেছিলেন, "যদি হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার নবুওয়াতের ওপর হামলা হচ্ছিল আর তুমি দরসগাহে বসে বসে বুখারী পড়াচ্ছিলে? তখন আমি কী উত্তর দিব?" তিনি স্বীয় শাগরিদদের এ বিষয়ে ওসিয়ত করেছিলেন। আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.), আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ.), মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি (রহ.) প্রমুখ পৃথিবী

আলো করা ছাত্রদের তিনি ওসিয়ত করেছিলেন যে, তোমরা যেখানেই থাকো দ্বীনের যে কাজে সম্পৃক্ত থাকো; মাদরাসায় পড়াও কিংবা ব্যবসা বা চাকরি করো, যাই করো না কেন, সর্বাবস্থায় তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াতকে নিজের প্রথম দায়িত্ব মনে করবে।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমি সাআদাত হাসিলের জন্য আজ আপনাদের এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছি। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করব, ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে যে আলোচনা করেছেন, আপনারা সে আলোচনার গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং আরো যারা সামনে আলোচনা করবেন, মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনুন। আপনারা নিজ সন্তানদেরকে একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলুন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবী, তারপর কাউকে নবী মনে করা —তা যে অর্থেই হোক— কিংবা নবীজি (সা.) সর্বশেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করা ইসলাম ও ঈমান থেকে বের হওয়ারই নামান্তর।

দারুল উলূম দেওবন্দে আলমী মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সমগ্র হিন্দুস্তানজুড়ে এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। আমাদের দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের বিশেষ গুণ হলো, নিজে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, অনেক বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং অসংখ্য মুরিদ থাকা সত্ত্বেও নিজের মারকাযের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং মাদারে ইলমী (দারুল উলূম দেওবন্দ) থেকে যখনই যে আহ্বান করা হয়, সে ডাকে লাব্বাইক বলেন, সে ডাকে সাড়া দিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

বাংলাদেশে এমন কিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে, ছাত্রসংখ্যার বিচারে তার কোনো কোনোটার ছাত্রসংখ্যা দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্রসংখ্যার সমান কিংবা তার চেয়েও বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সবাই দারুল উলূম দেওবন্দকে নিজেদের মারকায মনে করেন; মারকায মনে করার অর্থ শুধু এটুকুই নয় যে, সেখানকার নেসাব সেখানকার কিতাব পড়ানো হয় বা দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে কোনো শিক্ষক এখানে পড়াতে আসেন বা সেখান থেকে কোনো পরীক্ষক এসে এখানে পরীক্ষা নেন; বরং তারা দারুল উলূমকে এ হিসাবে মারকায মনে করেন যে, দ্বীনী জযবা, দ্বীনের বিশুদ্ধ আকীদা এবং দ্বীন হেফাযতের যে চেতনা দারুল উলূমের আকাবিরগণ নিজেদের মাঝে ধারণ করতেন, তা নিজেদের মাঝে ধারণ করার চেষ্টা করেন এবং সবসময় প্রস্তুত থাকেন যে, আমাদের মারকায থেকে দ্বীনের হেফাযতের জন্য যখনই যে ডাক আসবে, সে ডাকে আমরা সাড়া দেব। আজকের এই সমাবেশ এ ধারারই একটি অংশ।

আল্লাহ তায়ালা এই মজলিশকে কামিয়াব করুন!

ভাই, আমি অসুস্থ। খুব বেশি কথা বলার মতো অবস্থা আমার নেই; যা বলার সংক্ষেপে আপনাদের সামনে পেশ করেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং খতমে

নবুওয়াতের হেফাজতের জন্য আমাদের এই চেষ্টা ও মেহনতকে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন—আমিন।
"ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"

মুফতী মুহাম্মদ শফী রা এর আলোচনা।

খতমে নবুওয়াত (নবুওয়াতের সমাপ্তি) হলো ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস। এর অর্থ হলো, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষ নবী, এবং তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন নবী আসবেন না। কাদিয়ানী বা আহমাদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীরা এই মৌলিক বিশ্বাসের বিষয়ে এমন সব পরস্পর বিরোধী উক্তি করেছেন, যা মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত করে। তাদের এই উক্তিগুলো এতটাই অসংলগ্ন যে, অনেক সময় তাদের অনুসারীরাও নিজেদের আকীদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পায় না।
মীর্জা কাদিয়ানী এবং তার প্রতিনিধিদলের এই উক্তিগুলো অজ্ঞ মুসলমানদের নিজেদের দিকে আকর্ষণ করার অথবা প্রয়োজনানুযায়ী নিজেদের জামাতকে ইসলামী মিল্লাতের সাথে সংযুক্ত করার একটি কৌশল মাত্র। তাদের এসব ব্যাখ্যা নিশ্চিতভাবেই বাস্তব অবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল-প্রমাণ এবং "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে, মীর্জা কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের আসল বর্ণনা দ্বারা খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে তাদের প্রকৃত চিন্তা ও বিশ্বাস কী ছিল, তা প্রকাশ করা আবশ্যক।
খতমে নবুওয়াত সংক্রান্ত বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, খতমে নবুওয়াতের অর্থ এবং নবুওয়াত ও ওহীর দাবী সম্পর্কে মীর্জা সাহেবের উক্তিগুলোর মধ্যে যদি কোনো যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়, তবে তা শুধু এভাবেই হতে পারে যে, তাকে বিভিন্ন জীবনকাল ও বিভিন্ন যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে স্বীকার করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মীর্জা সাহেবের উপর দিয়ে তিনটি অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: ইসলামের অনুসারী হিসেবে (১৮৯১ খৃ.)
মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর জীবনের প্রথম অধ্যায় ছিল যখন তিনি একজন সাধারণ মুসলমানের মতোই ছিলেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কোনো নতুন ব্যাখ্যা বা বিকৃতি ছাড়াই মেনে নিতেন এবং ইসলামের একজন প্রচারক হিসেবে লেখালেখি করতেন।

এ সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য উক্তি:

- নবী ও রাসুলের সংজ্ঞা: তিনি বলেন, "ইসলামী পরিভাষায় নবী ও রাসুলের অর্থ হলো, তিনি পূর্ণাঙ্গ শরীআত নিয়ে প্রেরিত হয়ে থাকেন, অথবা পূর্ববর্তী শরীআতের কোনো অংশ বিলুপ্ত করে থাকেন। পূর্ববর্তী নবীর উম্মত হিসেবে পরিচিত হবেন না, আর কোনো নবীর কাছে থেকে কোনো রূপ ফায়দা লাভ করা ছাড়াই সরাসরিভাবে আল্লাহ'র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন।" (পত্র মসীহ মাওঊদ, ১৭ই আগস্ট, ১৮৯১ খৃ. বিতর্ক, রাওয়ালপিন্ডি, পৃ. ১৪৫)
- নবী ও উম্মত হওয়া পরস্পর বিরোধী: তিনি উল্লেখ করেন যে, "নবী ও উম্মত হওয়া পরস্পর বিরোধী" এবং "একই সাথে রাসুল ও উম্মত হওয়া পরস্পর বিরোধী।" (ইজালা ওহাম, পৃ. ৫৭৫)
- খতমে নবুওয়াত ও লা নবী বা'দী: তিনি বলেন, "কুরআনে খতমে নবুওয়াত কথাটি বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। অতএব, পুরনো বা নতুন নবী বলে কোনো রূপ পার্থক্য করা মারাত্মক অপরাধ। হাদীস 'আমার পরে কোনো নবী নেই' – এর মধ্যে 'লা' (ঌ) শব্দটি নাবাচক।" (আইয়ামিস সুলহি, পৃ. ১৪৬)
- ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার: তিনি স্পষ্ট করেন, "আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর ওহী বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর (সা.) উপর নবীদের ক্রমধারা সীলমোহর করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমাদের নবীর (সা.) পর আবার কি করে নবী আসতে পারে?" (হামামাতুল বাশরী, পৃ. ৩৪)
- কুরআনের মাধ্যমে নবুওয়াত পরিসমাপ্তি: "কুরআন মাজীদের প্রতিটি শব্দ অকাট্য, আর কুরআনের আয়াত – 'ওয়ালাকিন রাসুলুল্লাহে ওয়া খাতামুন নাবিয়্যীন' (তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী) – এই বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা নবুওয়াতের ক্রমধারা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।" (কিতাবুল বারীয়া, পৃ. ১৮৪)
- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঙ্গে সহমত: তিনি ঘোষণা করেন, "এ সমস্ত বিষয়ে (খতমে নবুওয়াত ও খাতিমুল আম্বিয়া) অন্যান্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতো আমার মাযহাবও একই।" (তাবলীগে রিসালাত, ২খ. পৃ. ২৪)
- নবুওয়াতের দাবিকারীদের প্রতি লানত: তিনি বলেন, "আমরা নবুওয়াতের দাবিকারীদের প্রতি লানত বর্ষণ করি।" (ইশতেহার, ২০ শাবান, তাবলীগে রিসালাত, পৃ. ২)

এই অধ্যায়ের উক্তিগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রথম জীবনে মুসলমানদের প্রচলিত আকীদা অনুযায়ী নিজেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত

হিসেবেই পরিচয় দিতেন এবং খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজেও নতুন নবুওয়াতের দাবিকে কুফুরী হিসেবে গণ্য করতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: নবুওয়াতের দাবি ও অর্থের পরিবর্তন (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের পরে)

এই অধ্যায়ে মীর্জা কাদিয়ানী ধীরে ধীরে মুজাদ্দিদ, মাহদি এবং প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবি করা শুরু করেন। এই দাবিগুলো করতে গিয়ে তিনি অনুভব করেন যে, প্রতিশ্রুত মাসীহ যেহেতু একজন নবী ছিলেন, তাই তার এই দাবি খতমে নবুওয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। ফলে তিনি খতমে নবুওয়াতের অর্থ পরিবর্তন করতে শুরু করেন। তিনি নবুওয়াতের বিভিন্ন কৃত্রিম প্রকারভেদ যেমন - শরীআতী, শরীআতবিহীন, যিল্লী, বরোজী, আক্ষরিক, নকল ইত্যাদি বর্ণনা করে খতমে নবুওয়াতের সঠিক ধারণায় সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। তিনি দাবি করেন যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পরেও নবুওয়াতের কিছু প্রকার চালু থাকবে এবং নিজেকে সেই ধরনের নবী হিসেবে উপস্থাপন করেন।

এ সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য উক্তি:

- নবীর সংজ্ঞায় পরিবর্তন: "এখন থেকে মুহাম্মাদী নবুওয়াত ছাড়া সমস্ত নবুওয়াত বন্ধ। শরীআত নিয়ে কোনো নবী আসবেন না। তবে শরীআত ছাড়া নবী আসতে পারেন, কিন্তু তাকে পূর্ববর্তী নবীর উম্মত হতে হবে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি উম্মতও, আর নবীও।" (তাজাল্লীয়াতে ইলাহীয়া, পৃ. ২৫)
- নবুওয়াতের নতুন ব্যাখ্যা: "বর্তমান যুগে নবী শব্দটির অর্থ শুধু এই যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন ও আলাপচারিতার মর্যাদা লাভা করবে এবং দ্বীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশিত হবে। কোনো নতুন শরীআত নিয়ে আসবে, তা নয়। কেননা, শরীআত নাযিল হওয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে শেষ হয়ে গিয়েছে।" (তাজাল্লীয়াতে ইলাহীয়া, পৃ. ৯)
- নিজের নবী হওয়ার দাবি: "আমার মতে নবী তাকেই বলা হয়, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী অকাট্য ও স্পষ্টভাবে অবতীর্ণ হয়, যা গায়বের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আমার নাম নবী রেখেছেন, যদিও শরীআতবিহীন।" (তাজাল্লীয়াতে ইলাহীয়া, পৃ. ২৬)
- উম্মতী নবী: "এ উম্মতের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণের বরকতে হাজার হাজার আউলিয়া এসেছেন। এর মধ্যে একজন এমন, যে উম্মতও, আর নবীও।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ২৮)
- নবুওয়াতের মোহর দ্বারা নবী তৈরি: "আল্লাহ'র মোহর এ কাজ করেছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকারী এ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে

যে, একদিকে তিনি উম্মত আর অন্যদিক দিয়ে তিনি নবী।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ৯৬)

- খাতামুন নাবিয়্যীন হওয়া সত্ত্বেও নবুওয়াত: "তারপর ঐ ব্যক্তির (প্রতিশ্রুত মসীহ) নবুওয়াতের দাবি সত্ত্বেও যার নাম প্রতিচ্ছায়া হিসেবে মুহাম্মাদ ও আহমাদ রাখা হয়েছে। এরপরও সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যীন হয়েছেন।" (এক গলতি কা ইজালাহ, পৃ. ১৩৮)
- শরীয়তবিহীন নবী হওয়ার অস্বীকার নয়: "যে সমস্ত জায়গায় আমি নবুওয়াত বা রিসালাত সম্পর্কে অস্বীকার করেছি তা শুধু এ অর্থে যে, আমি পৃথকভাবে কোনো শরীআত নিয়ে আসিনি এবং পৃথক কোনো নবীও নই... কিন্তু কোনো নতুন শরীআত ছাড়া এরূপ নবী বলাতে আমি কখনো অস্বীকার করিনি, বরং এসব অর্থে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী ও রাসুল বলে আহবান করেছেন। সুতরাং এখনো আমি এ অর্থে নবী ও রাসুল হওয়ার কথা অস্বীকার করি না।" (ইশতিহার, এক গলতি কা ইজালাহ, পৃ. ১৪২)

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের উক্তিগুলো থেকে মীর্জা কাদিয়ানীর বিশ্বাসে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'নবী' শব্দের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেকে 'উম্মতী নবী' বা 'শরীয়তবিহীন নবী' হিসেবে দাবি করেন। তিনি পূর্ববর্তী নবীদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের মোহরকে নবী তৈরির ক্ষমতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকাশ্যে নবুওয়াত, রিসালাত ও ওহীর দাবি

এই অধ্যায়ে মীর্জা কাদিয়ানী খতমে নবুওয়াতের ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন থেকে সরে এসে নবুওয়াতের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে নিজেকে প্রকাশ্যে শরীআতযুক্ত নবী বলেও দাবি করেন।

এ সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য উক্তি:

- নিজেকে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী: "আমি ঐ আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন আর তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন।" (তাতিম্মা, হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ৬৮)
- নিজেকে পূর্ববর্তী নবীদের সমকক্ষ দাবি: "আমি আদম, শীস, নূহ, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, দাউদ, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই নামের উত্তম প্রকাশ। প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ আমি মুহাম্মাদ ও আহমাদ।" (হাশিয়া, হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ৭২)
- ঈসা (আ.) থেকে উত্তম হওয়ার দাবি: "ইবনে মারিয়ামের স্মরণ ও চিন্তাধারা ছেড়ে দাও। তার চেয়ে উত্তম বান্দা আহমাদ।" (দাফেউল বালা, পৃ. ২) এমনকি তিনি ঈসা (আ.) এর

বংশ এবং তার 'মিথ্যা বলার অভ্যাস' নিয়েও আপত্তিকর মন্তব্য করেন (হাশিয়া, আনজাম আতহাম, পৃ. ৭)।

- মুহাম্মদ (সা.) থেকে উত্তম হওয়ার দাবি: "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আমার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কেননা, সর্বদা আমার আল্লাহ'র সাহায্য ও সহযোগিতা মিলে থাকে।" (নুযূলুল মসীহ, পৃ. ৯৬)
- নিজের মুজিযার সংখ্যা বেশি: তিনি নিজের মুজিযার সংখ্যা ১০ লাখ দাবি করেন, যেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুজিযার সংখ্যা মাত্র ৩ হাজার লেখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। (বারহিনে আহমাদীয়ার ৫ম খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠা)
- হাদীসের অবমাননা: "আমি আল্লাহ'র শপথ নিয়ে ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলছি যে, আমার এ দাবির ভিত্তি হাদীস নয়, বরং কুরআন আর ওহী – যা আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তবে সাহায্যের জন্য (প্রমাণস্বরূপ) ঐ সমস্ত হাদীসও গ্রহণ করে থাকি যা কুরআন শরীফ অনুযায়ী হয় আর আমার ওহীর বিরুদ্ধে না হয়। অন্যান্য হাদীসকে আমরা অকেজো বলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকি।" (ইযাজে আহমাদী, পৃ. ৩০.৩১)
- শরীয়ত প্রবর্তনের দাবি: তিনি দাবি করেন, তার ওহীর মাঝে বিধি-নিষেধ রয়েছে এবং শরীআতের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা রয়েছে, যা তাকে শরীআতের অধিকারী প্রমাণ করে। (হাশিয়া আরবাঈন, পৃ. ৭)
- তাকে অস্বীকারকারী মুসলমানদেরকে কাফির বলা: "যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে না, তোমার বায়আত গ্রহণ করবে না আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী দোযখী।" (ইলহামে মীর্জা গোলাম আহমাদ, তাবলীগে রিসালাত, ৯খ. পৃ. ৬৭) তিনি আরও বলেন, "সমস্ত মুসলমান যারা প্রতিশ্রুত মসীহ'র বায়আতে শামিল হয়নি, এমনকি যদিও তারা মসীহ মাওঊদের নাম না শুনে থাকে, তবুও তারা কাফির আর ইসলাম বহির্ভূত।" (আয়নায় সাদাকাত, পৃ. ৩৫)
- অন্য মুসলমানদের পিছনে নামায পড়া নিষেধ: "আমাদের কর্তব্য হলো, আহমাদীয়া ছাড়া অন্যদেরকে আমরা মুসলমান মনে করবো না আর তাদের পিছনে নামায পড়বো না। কেননা আমাদের মতে তারা আল্লাহ তা'আলার একজন নবীকে অস্বীকার করে।" (আনওয়ারে খিলাফত, মীর্জা বশিরুদ্দীন মাহমুদ কাদিয়ানী, পৃ. ৯০)

এই তৃতীয় অধ্যায়ে মীর্জা কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের চরমপন্থী মনোভাব এবং অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠোর ভাষা ও কুফরের ফতোয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের মতে, মীর্জা কাদিয়ানীকে অস্বীকারকারী সবাই কাফির, এমনকি যারা তাকে ভালো জানে কিন্তু বায়আত গ্রহণ করেনি, তারাও।

খতমে নবুওয়াতের অর্থের পরিবর্তন, ব্যাখ্যায় বৈপরীত্য আর অসংলগ্ন আলোচনা

মীর্জা কাদিয়ানী তার ধারণার সমর্থনে খতমে নবুওয়াতের ঐতিহ্যবাহী অর্থকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে দেন, যা মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিরোধী।

- 'খাতামুন নাবিয়্যীন' অর্থ 'নবী তৈরির ক্ষমতা': তিনি 'খাতামুন নাবিয়্যীন' অর্থ করেন 'আখেরী নবী' নয়, বরং এমন একজন নবী যাকে 'নবী তৈরির ক্ষমতা ও ইখতিয়ার' দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ নবুওয়াতের পূর্ণতা দান করে এবং তার দৃষ্টি আত্মিক নবী তৈরি করে। (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ৯৭)
- মুহাম্মদই আহমাদ: তিনি দাবি করেন, 'খাতিমুন নাবিয়্যীনের অর্থ এটাই যা সমস্ত মুসলমান বুঝে থাকে। কিন্তু মীর্জা সাহেবের নবী হওয়া এর বিরোধী নয়। কেননা (মা'আযাল্লাহ) মুহাম্মাদই আহমাদ।' (নুযূলে মসীহ, পৃ. ৩)
- শরীয়ত খতম, নবুওয়াত নয়: তিনি দাবি করেন, শরীআত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর খতম হয়েছে, কিন্তু নবুওয়াত খতম হয়নি। তার মতে, নবীর কাজ হলো আল্লাহর সাথে কথোপকথন ও দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করা, নতুন শরীআত নিয়ে আসা নয়। (তাজাল্লিয়াতে ইলাহীয়া, পৃ. ৯)

এই ধারাবাহিক আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী সময়ের সাথে সাথে তার দাবি এবং খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা পরিবর্তন করেছেন। প্রথমদিকে তিনি নিজেকে একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে উপস্থাপন করলেও, ধীরে ধীরে তিনি নবুওয়াতের দাবি করেন এবং অবশেষে নিজেকে শরীআতধারী নবী হিসেবে ঘোষণা করেন। তার এই পরিবর্তনশীল ও পরস্পরবিরোধী উক্তিগুলো মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত।

পবিত্র কুরআনে খতমে নবুওয়াত: একটি গভীর বিশ্লেষণ

ইসলামে খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের সমাপ্তি একটি মৌলিক আকীদা (বিশ্বাস)। এর অর্থ হলো, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন নবী আসবেন না। এই আকীদা পবিত্র কুরআন ও অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এই আলোচনায় পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও এর আত্মনির্হিত তাৎপর্য তুলে ধরা হবে। প্রথম আয়াত ও তার শানে নুযূল

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّـهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ'র রাসুল ও নবুওয়াতের ক্রমধারা সমাপ্তকারী বা শেষ নবী; আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞ।" (সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ৪০)

শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ)

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পেছনে এক বিশেষ উপলক্ষ ছিল। নবুওয়াতের আলোকরশ্মি উদয়ের পূর্বে সমগ্র আরব সমাজে বহু ধ্বংসাত্মক, হাস্যকর ও লজ্জাজনক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল পালিত পুত্রকে ঔরসজাত সন্তানের মতো মনে করা। পালিত পুত্রকে নিজের পুত্র হিসেবে ডাকা হতো, মৃত্যুর পর সে সম্পত্তির অংশীদার হতো এবং তার সাথে রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে হালাল-হারামের সমস্ত আহকাম স্বীকার করা হতো। যেমন, ঔরসজাত ছেলের মৃত্যুর পর বা তালাক দেওয়ার পর তার বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পিতার জন্য বিয়ে করা হারাম, তেমনি পোষ্যপুত্রের ক্ষেত্রেও এটি হারাম মনে করা হতো।

এই প্রথা ও রীতির ফলে নানাবিধ জটিলতা ও ফাসাদের সৃষ্টি হতো, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: ১. বংশের মিশ্রণ। ২. শরীআত অনুযায়ী যে অংশীদার নয়, তাকে অংশীদার হিসেবে গণ্য করা। ৩. শরীআত অনুযায়ী হালালকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম জানা।

যে ইসলাম কুফর ও গোমরাহীর কুপ্রথাগুলো থেকে দুনিয়াকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এসেছিল এবং সেসব প্রথার মূলোৎপাটনই যার লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেই ইসলাম এতো বড় একটা কুপ্রথাকে কিছুতেই বৈধ মনে করতে পারত না। সুতরাং ইসলাম এর জন্য দুটি পন্থা অবলম্বন করেছে: বর্ণনামূলক এবং বাস্তবে পালন।

একদিকে এই ঘোষণা করা হয়েছে: "আল্লাহ তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তোমাদের ঔরসজাত পুত্র হিসেবে স্থির করেননি। এটা তোমাদের মুখের কথা, আল্লাহ সঠিক কথা বলেন আর তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। পোষ্যপুত্রদেরকে তাদের পিতার নামে আহবান করো, এটিই আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত কাজ।" (সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ৪-৫) বংশ ও

সম্পত্তির অংশীদারিত্বে এবং হারাম ও হালাল ইত্যাদিতে পালিত পুত্রকে ঔরসজাত পুত্রবৎ মনে না করা এবং তাকে তার জন্মদাতা পিতার সন্তান হিসেবে ডাকা ও পরিচয় দান করাই আল্লাহর কাছে ইনসাফপূর্ণ বিধান। এই পর্যায়ে পূর্ববর্ণিত প্রথাটি রহিত করাই এই আয়াতটির উদ্দেশ্য।

ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা.) যায়দ ইবনে হারিসা (রা.)-কে (যিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গোলাম ছিলেন) আযাদ করে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। সমস্ত লোক এমনকি সাহাবায়ে কিরাম পর্যন্ত আরবের পুরনো রীতি অনুযায়ী তাকে যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ বলে ডাকতো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়, ঐ সময় আমরা ঐ রীতি ছেড়ে তাকে যায়দ ইবনে হারিসা বলে ডাকা শুরু করি। সাহাবায়ে কিরাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে পুরনো রীতি ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রচলিত কোনো রীতির বিরোধিতা ও পরিত্যাগ করা হলে আত্মীয়-স্বজন ও স্বীয় গোত্রের হাজারো ঠাট্টা-বিদ্রুপের শিকার হতে হয়, যা সহ্য করা প্রত্যেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এই কুপ্রথাটিকে স্বীয় রাসুল (সা.)-এর দ্বারা বাস্তবভাবে রহিত করাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। সুতরাং যখন যায়দ (রা.) স্বীয় স্ত্রী যয়নাব (রা.)-কে পারস্পরিক তিক্ততার কারণে তালাক দেন, তখন আল্লাহ স্বীয় রাসুল (সা.)-কে নির্দেশ দেন তাকে বিয়ে করার, যেন এই রীতিটি চিরতরে ও সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটিত হয়ে যায়। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে:

"...এরপর যায়দ যখন তার থেকে প্রয়োজন শেষ করলো (অর্থাৎ, তালাক দিলো), তখন আমি তার সাথে তোমাকে বিয়ে দিলাম, যেন মুমিনদের জন্য কোন অসুবিধা না থাকে তাদের পালকপুত্রদের স্ত্রীদের (বিয়ে করার) ক্ষেত্রে..." (সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর নির্দেশে বিয়ে করেন। এদিকে পূর্বের ধারণা অনুযায়ী সমস্ত আরবের কাফিরদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি হলো যে, "এই নবীকে (সা.) দেখো, নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন।"

এই সমস্ত লোকের নিন্দা ও প্রতিবাদের উত্তরে ঐ আয়াত নাযিল হয়, যা আমরা এখানে দলীল হিসেবে উল্লেখ করছি: "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ'র রাসুল ও নবুওয়াতের ক্রমধারা সমাপ্তকারী বা শেষ নবী..." (সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ৪০)

আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো পুরুষের বংশগত পিতা নন। যায়দ (রা.)-এরও বংশগত পিতা নন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা জায়েয ও উত্তম হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে নিন্দা করা সম্পূর্ণ বোকামি ও মূর্খতা।

তাদের দাবি রহিত করার জন্য এতটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) যায়দ (রা.)-এর পিতা নন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার নিন্দাকারীদেরকে অতি কঠোরভাবে প্রতিহত ও তাদের কথাকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করার জন্য এই বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। কথা শুধু এতটুকুই নয় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) যায়দ (রা.)-এর পিতা নন, বরং তিনি (সা.) কোনো পুরুষেরই পিতা নন। অর্থাৎ তার (সা.) কোনো পুত্র সন্তানই নেই। অতএব, তিনি (সা.) নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন, এরূপ অপবাদ দেওয়া অতি বড় যুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

যদি বলা হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চারজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন – (১) কাসিম, (২) তাইয়্যেব, (৩) তাহের – খাদিজা (রা.)-এর গর্ভজাত এবং (৪) ইব্রাহীম – মারিয়া কিবতীয়া (রা.)-এর গর্ভজাত, তাহলে তিনি (সা.) কারো পিতা নন বলা কেমন করে যথার্থ হতে পারে? এর উত্তর স্বয়ং কুরআনে কারীমের শব্দে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো পুরুষের পিতা নন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চারজন পুত্রই শিশুকালে ইন্তিকাল করেছেন। তাদেরকে পুরুষ বলার সময় ও সুযোগ হয়নি। আয়াতে "রিজালুকুম" (رجالكم) শব্দ এ কারণেই সংযোজন করা হয়েছে।

অধিকন্তু এটাও বলা যায় যে, আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না। কাসিম, তাইয়্যেব ও তাহের ইন্তিকাল করেছিলেন এবং ইব্রাহীম তখনো জন্মগ্রহণ করেননি। তাই ঐ সময়ের প্রেক্ষিতে সাধারণভাবে এটা বলা বৈধ যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো পুরুষ বা ছেলের পিতা নন।

মোট কথা, এই আয়াতটির নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর কাফির ও মুনাফিকদের আরোপিত কলঙ্ক অপনোদন করা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্রতা ও উঁচু মর্যাদা বর্ণনা করা, আর এটিই আয়াতের শানে নুযূল।

আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যাংশ: নবুওয়াতের ক্রমধারা সমাপ্তকারী

এরপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: "...কিন্তু তিনি আল্লাহ'র রাসুল ও নবুওয়াতের ক্রমধারা সমাপ্তকারী বা শেষ নবী..." (সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ৪০)

এই বাক্যাংশের সাথে আমাদের বক্তব্য অধিক সম্পর্কিত। সুতরাং পরবর্তীতে আমাদের আলোচনা, বর্ণনা ও তাফসীর শুধু এই বাক্য সম্পর্কেই হবে। কিন্তু এর পূর্বে আয়াতের তাফসীর পূর্বে উল্লিখিত নীতি (আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি) অনুযায়ী কুরআন ও হাদিস ইত্যাদির সাহায্যে পেশ করবো। এই বাক্যাংশে প্রথম বাক্যের সাথে কী সম্পর্ক রাখে, তাও বলা আবশ্যক। আয়াতের মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার জন্য তা খুবই সহায়ক হবে।

উপর্যুক্ত আয়াতে উভয় বাক্যের মধ্যে পার্থক্য

আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো পুরুষের পিতা নন। সাধারণ পর্যবেক্ষণে এর ওপর কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। এটা দূর করার জন্য দ্বিতীয় বাক্যটি "ওয়ালাকিন" (ولكن) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কেননা আরবি ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী প্রথম বাক্যে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, দ্বিতীয় বাক্যে তা দূর করার উদ্দেশ্যেই এই শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। ঐ সন্দেহগুলো হলো:

প্রথমত, পিতৃত্বের জন্য যে পিতৃস্নেহের প্রয়োজন, তা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বর্তমান ছিল না। অথচ একজন নবী ও রাসুলের জন্য উম্মতের উপর অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হওয়া খুবই প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রত্যেক নবী স্বীয় জাতি ও উম্মতের পিতৃতুল্য হয়ে থাকেন। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহ.) বলেন, "যদি কোনো জিনিসের সৃষ্টি, সংশোধন, সংস্কার কিংবা প্রকাশমান হওয়ার নিমিত্ত হয়, তাকেই সে জিনিসের পিতা বলা হয়। এ কারণেই নবী করীম (সা.)-কে মুমিনদের পিতা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: 'নবী মুমিনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের তুলনায়ও অধিক দায়িত্বশীল, তার স্ত্রীগণ তাদের মা, ...' (সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ৬) কোনো কোনো পাঠে 'আওলী' (নিকটবর্তী দায়িত্বশীল) এর পরিবর্তে তাকে (নবী সা.) পিতা 'আব' বলা হয়েছে।" সারকথা হলো, নবী হওয়ার জন্য পিতা হওয়া আবশ্যক। তাই যখন উপর্যুক্ত আয়াতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পিতৃত্বকে (পিতা হওয়া) অস্বীকার করা হয়েছে, তখন সাধারণ পাঠকের মনে এই সন্দেহ জাগতে পারে যে, তিনি (সা.) যখন কারো পিতা নন, তখন হয়তো তার (সা.) নবুওয়াতও নেই।

তৃতীয়ত, যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পিতৃত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে, তখন এর বাহ্যিক দৃষ্টিতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গুণাবলীর মধ্যে অনিবার্যভাবে এক প্রকারের ঘাটতি দেখা দেয়। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো জীবিত পুত্র নেই। অধিকন্তু এর দরুন কাফিরদের হাসি-ঠাট্টারও একটা সুযোগ হয়ে যায়, যা তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আবতার (ابتر) বা সন্তানহীন হওয়া ত্রুটি হিসেবে প্রচার করতো।

মোটকথা এই যে, আয়াতের প্রথম বাক্যে এ ধরণের কিছু সন্দেহ পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। এগুলো দূর করার জন্য ইরশাদ হয়েছে: "...কিন্তু তিনি আল্লাহ'র রাসুল..."

এখানে, "লাকিন" (لكن) শব্দ দ্বারা উপর্যুক্ত সন্দেহ দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদিও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো ঔরসজাত পুত্র ছিল না, আর তিনি (সা.) এই দৃষ্টিতে কোনো পুরুষের পিতা নন, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর রাসুল ছিলেন এবং রাসুল স্বীয় উম্মতের পিতা হয়ে থাকেন। যেমন আমরা উপরে ইমাম রাগিবের বর্ণনা উদ্ধৃত করে এসেছি যে,

কোনো কোনো পাঠে পবিত্র কুরআন স্বয়ং নবী করীম (সা.)-কে মুসলমানদের পিতা বলে ঘোষণা করেছে। এ কারণেই লুত (আ.) স্বীয় উম্মতের মেয়েদের সম্পর্কে বলেছেন:

"...এগুলো আমার কন্যা..." (সূরাহ হুদ, ১১ : ৭৮) (এ কথা নবী হিসেবেই বলেছিলেন, যদিও তারা তার ঔরসজাত নয়)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর লাখো সন্তান রয়েছে, আর তিনি (সা.) লাখো পুরুষের পিতা। এর সারকথা হলো, পিতৃত্ব দুই প্রকার: প্রথম প্রকার হচ্ছে, দৈহিক পিতৃত্ব (বংশগত ও দুগ্ধজাত), যার উপর হালাল-হারামের আহকাম আরোপিত হয় আর যার ফলে পুত্রবধূ হারাম হয়ে যায় ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, আত্মিক পিতৃত্ব, যার উপর হালাল-হারামের আহকাম আরোপিত হয় না। তবে সন্তানের পক্ষ থেকে সম্মান আর পিতার পক্ষ থেকে স্নেহ-মমতা ঔরসজাত ও বংশগত পিতার মতো, বরং তার চেয়ে অধিক হওয়া প্রয়োজন। যেমন উস্তাদের পিতৃ সম্পর্ক ছাত্রের জন্য আর পীরের সম্পর্ক মুরিদের জন্য অথবা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্নেহ-মুহাব্বাত ও সম্পর্ক সমগ্র উম্মতের জন্য। সুতরাং – "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন" – এ আয়াতাংশের মধ্যে প্রাথমিক অর্থে পিতৃত্বের অস্বীকৃতি, আর – "কিন্তু তিনি আল্লাহ'র রাসুল" এ আয়াতাংশের মধ্যে পিতৃত্বের স্বীকৃতি রয়েছে।

এই একটি বাক্য তিনটি সন্দেহ দূরীভূত করেছে, কেননা – ১. এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বীয় উম্মতের আত্মিক বা রূহানী পিতা এবং রূহানী পিতা অর্থাৎ রাসুল (সা.)-এর স্নেহ-মমতা ও অনুগ্রহ স্বীয় সন্তানের ওপর বংশগত পিতার তুলনায় বেশী হয়ে থাকে। এজন্য রাসুল (সা.)-এর বংশগত পিতা না হওয়ায় তাঁর (সা.) স্নেহ-মমতা ও অনুগ্রহ কম হওয়া জরুরী নয়। ২. এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীর জন্য যে ধরণের পিতা হওয়া প্রয়োজন তা আয়াতে অস্বীকার করা হয়নি, বরং বংশগত ও দুগ্ধজাত পিতা হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় সন্দেহকেও দূরীভূত হয়েছে। ৩. এটিও অতি সুন্দরভাবে প্রতীয়মান হলো যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সন্তানহীন ও বংশহীন নন। কাফিররা তাকে (সা.) যা বলে তা ভিত্তিহীন। বরং রাসুল (সা.)-এর এতো অধিক সন্তান রয়েছে, যা আজ পর্যন্ত কারো জন্য হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতের মধ্যে অসংখ্য পুরুষের পিতা। এর দ্বারা তৃতীয় সন্দেহটিও দূরীভূত হয়েছে। এই তিনটি সন্দেহই উপর্যুক্ত বর্ণনার দ্বারা অপনোদিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে স্বীয় রাসুল (সা.)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করতে তাঁর (সা.) গুণাবলী ও কামালাত এবং সবচেয়ে মমতা ও স্নেহপ্রবণ হওয়ার গুণ সম্পর্কে জ্ঞাত করতে ইচ্ছুক, যেন গাফিল সজাগ হয়ে যায় আর আল্লাহ তা'আলার শেষ রাসুল (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে:

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ অর্থাৎ, তিনি নবী-রাসুলগণের ক্রমধারা খতমকারী, তিনি শেষ নবী।

সর্বজ্ঞানী ও হিফাযতকারী আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র কালামের এক-একটি শব্দে কী কী রহস্য ও সূক্ষ্ম ব্যাপার রেখে দিয়েছেন আর এতে কী কী কল্যাণের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তা তিনিই সর্বাধিক জানেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি, তা বর্ণনা করছি। এই আয়াতটিতে কতগুলো কল্যাণকর তাৎপর্য লক্ষ্য করা যেতে পারে, যেমন:

১. যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবতার বা নির্বংশ হওয়ার কুৎসা রটনা করে, তাদেরকে যেন বলে দেওয়া হলো যে, "হে ভ্রান্তের দল, তোমরা যে পবিত্র মহামানবের (সা.) ওপর আবতার (নিঃসন্তান) হওয়ার কালিমা লেওপন করছো, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কেননা তিনি (সা.) এতো অসংখ্য সৃষ্টিকুলের পিতা, যা কারো ধারণা ও কল্পনায়ও আসতে পারে না।"

প্রথমত, অধিকাংশ রাসুল স্বীয় উম্মতের পিতা হওয়ার কারণে এতো অসংখ্য বংশধারা ও সন্তান রাখেন, যা কোনো মানুষ ধারণা করতে পারে না এবং তার (সা.) ইন্তিকালের পর যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো রাসুল প্রেরিত না হোন, ততদিন পর্যন্ত তার উম্মতের মর্ত্যে জন্মগ্রহণকারী সমস্ত মানুষই তার সন্তানরূপে গণ্য। এভাবেই তার (সা.) পিতৃত্বের ক্রমধারা অব্যাহত ধারায় চলতে থাকে। এরপর বিশেষত এই সম্মানিত নবী (সা.) শেষ নবী, তার (সা.) পর কোনো নবী আসবেন না। তাই তার (সা.) পিতৃত্বের ক্রমধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে অসংখ্য মুসলমান জন্মগ্রহণ করবে, সকলেই তার (সা.) সন্তানরূপে গণ্য হবে। তাই তিনি (সা.) সমস্ত নবী ও রাসুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সন্তানের পিতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এটা বলা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সন্তানের ধারক, তাহলে তা কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। এটাই উদ্দেশ্য ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিম্নলিখিত ফরমান ও নির্দেশের: "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্যান্য উম্মতের উপর গৌরব করবো।" মোটকথা, আয়াতে "রাসূলুল্লাহ" শব্দ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) নিঃসন্তান ছিলেন না, বরং রাসুল হওয়ার কারণে তার (সা.) অসংখ্য সন্তান রয়েছে। এরপর "খাতামুন নাবিয়্যীন" বলে কাফিরদেরকে পূর্ণভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত করা আর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্ণতাকে অত্যন্ত ঔজ্জ্বল্যের সাথে প্রকাশ করার জন্য সম্ভবত এই দাবি করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) অধিক সন্তানের ধারক ছিলেন, শুধু তাই নয়, এই নীল আকাশের ও যমিনের মাঝে সৃষ্ট কোনো ব্যক্তিই সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সমকক্ষ হতে পারবে না। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পিতৃত্বের ক্রমধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পর আর কোনো নবী আসবে না। সে সাথে এই অঙ্গীকারও রয়েছে যে, এই দৃঢ় ও মজবুত দ্বীন কখনোই পরিবর্তন হবে না, মানুষ ক্রমাগতভাবে এই দ্বীনকেই গ্রহণ করতে থাকবে। তাই এর সংখ্যা হবে কল্পনাতীত। হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ

বলবেন, মুহাম্মাদের (সা.) সাথে যতো মানুষ এসেছে, এতো মানুষ আর কোনো নবীর সাথে আসেনি। দ্বিতীয়ত, এখানে "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দ যোগ করে হয়তো সমগ্র বিশ্বের মানব জাতিকে এই বিষয়ের ওপর সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, হে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকারী ও উচ্চাভিলাষী লোকসকল, ইনিই (সা.) আমাদের শেষ নবী। তিনি (সা.) আমাদের শেষ পয়গাম ও নির্দেশাবলী নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন। এখনো সতর্ক হয়ে যাও আর তার (সা.) অনুসরণ করে ইহকাল ও পরকাল এবং পরকালের জীবন ও জীবিকাকে নিশ্চিত করে নাও। এরপর কোনো নতুন আসমানি পয়গাম পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করা হবে না এবং নতুন কোনো পয়গম্বরও আবির্ভূত হবেন না। তাই এখন ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ শুধু তাকে (সা.) অনুসরণের মধ্যে নিহিত। তাঁর নির্দেশকে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করো আর ঠাট্টা-বিদ্রুপ থেকে বিরত থাকো।

এই কথাটি ঠিক এই ধরণের, যেমন দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষায় বলা হয়ে থাকে যে – দেখো, এটা আমার শেষ কথা বা শেষ উপদেশ, এটা মূল্যবান মনে করো ও গ্রহণ করো। তৃতীয়ত, যখন – "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন" – বাক্যে রাসূলে কারীম (সা.)-এর পিতৃত্বের অস্বীকৃতিতে কারোর মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃতিতে পিতৃস্নেহ বিদ্যমান নেই। তাই এটাকে রহিত করার জন্য "কিন্তু তিনি আল্লাহ'র রাসুল" বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও রাসুলুল্লাহ (সা.) কারো বংশগত পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ'র রাসুল হওয়ার কারণে বংশগত পিতা হওয়ার তুলনায় অনেক বেশী স্নেহশীল। এরপর এই স্নেহ-মমতার পূর্ণতা বর্ণনা করার জন্য ইরশাদ হয়েছে: وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ। অর্থাৎ, প্রথমত প্রত্যেক রাসুল স্বীয় উম্মতের পিতা এবং স্নেহ-মমতায় (বংশগত) পিতা অপেক্ষা বেশী স্নেহশীল। বিশেষত তিনি (সা.) হলেন শেষ নবী, যার (সা.) পর কোনো নবীর আগমন হবে না। এ অবস্থায় এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সমস্ত নবী (আলাইহিমুস সালাম) থেকে বেশী স্নেহশীল হবেন এবং উম্মতের হিদায়াত, নসীহত ও মঙ্গলের জন্য কোনো সূক্ষ্ম বস্তুও তিনি (সা.) বাকি রাখবেন না। কেননা যে রাসুলের পরে অন্য রাসুল ও নবী আগমনের প্রত্যাশা থাকে, আর তখন যদি কোনো বস্তু বা বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাহলে পরবর্তী আগমনকারী নবীগণ তা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু যিনি সমস্ত নবী-রাসুলের সর্বশেষ হবেন, তাঁর এটা চিন্তা হবে যে, মানবজাতির জন্য তিনি জীবন চলার পথকে এমনই সুগম করে যাবেন, যাতে তাদের ভবিষ্যতে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, এটাই তো স্বাভাবিক। মোটকথা, তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের স্নেহ-মমতার কাজ করবেন। যেমন একজন বংশগত পিতা তার অবর্তমানে রেখে যাওয়া স্বীয় সন্তানাদি সম্বন্ধে অধিক চিন্তিত হবেন। বিশেষ করে যখন তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তার সন্তানদের পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার কেউ না থাকে, তখন পিতার স্নেহ-মমতায় যে কতটুকু

তীব্রতা প্রকাশিত হবে তা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থায় পিতা স্বীয় জীবনকালে এরূপ আসবাব বা ধন-সম্পদ জমা করার চিন্তা করবেন, যেন ভবিষ্যতে তার সন্তানগণ কারো মুখাপেক্ষী না হয়। সুতরাং আমাদের আকা-ই-নামদার সরওয়ারে কায়েনাত (সা.) আমাদের জন্য শরীআতের সঠিক পথ এমনই স্পষ্ট করে গিয়েছেন যে, তা রাত ও দিনের মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পর পূর্ববর্তী শরীআতের কোনো প্রয়োজন থাকেনি। পবিত্র কুরআন এই শরীআতের অনন্তকালের জন্য পরিপূর্ণতার কথা নিম্নলিখিত আয়াতে ঘোষণা করেছে: "...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম..." (সূরাহ আল-মাইদাহ, ৫ : ৩)

এর দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী শরীআত অনন্তকালের জন্য পূর্ণতা এবং বাস্তব অর্থে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ছিল না। যদিও সে সময়ের ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত পরিপূর্ণ ছিল এবং এটাই আয়াতের মর্মার্থ। ইমাম রাযী (রহ.) তার "তাফসীরে কাবীর"-এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। মোটকথা, কুরআনের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ শরীআতকে অনন্তকালের জন্য পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। তাই স্বীয় নবীর (সা.) পর কোনো নবীরও প্রয়োজন নেই এবং কোনো নতুন শরীআত উপস্থাপনকারীরও প্রয়োজন নেই। আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহ.) বলেন, "উম্মাতে মুহাম্মাদীর বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কারণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। তারা কোনো নবীর মুখাপেক্ষী নয়, না কোনো নতুন শরীআতদার, বরং ঐ সমস্ত গুণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃতিতে একত্র করা হয়েছে, যা অন্যান্য নবীর মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে ছিল।" (রিসালাতিল ফুরকান, পৃষ্ঠা ৫৬)

মোটকথা, এই "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দ দ্বারা এটা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তুলনামূলকভাবে অন্যান্য আম্বিয়া-কিরামের তুলনায় অনেক বেশী স্নেহশীল ছিলেন। এরপর আমরা আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর পাঠকের সামনে পেশ করবো। এতে তাফসীরের মানদণ্ড হিসেবে উলামায়ে উম্মত কর্তৃক নির্ধারিত মৌলনীতি অনুসরণ করা হবে। কিন্তু প্রত্যেকের প্রথম দৃষ্টি বাক্য ও ব্যবহৃত শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থের উপর পড়ে এবং তা ঐ ভাষার কাওয়ায়েদ বা ব্যাকরণের সাহায্যে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করে বিধায় বর্ণনার ক্রমধারায় আমরা প্রথমে লুগাতে আরব এর প্রতি লক্ষ্য রেখেছি এবং এরপর অবশিষ্ট পদ্ধতিগুলো ক্রম অনুসারে পেশ করা হবে। আরবি অভিধানের আলোকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর: আভিধানিক আলোচনা আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি শব্দ রয়েছে: وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّـهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ যার মধ্যে "ওয়াও" (واؤ) হলো 'আত্বফ' বা সম্পর্কের জন্য, "লাকিন" (لکن) 'ইসতিদরাক' বা সন্দেহ দূরীকরণের জন্য। শব্দের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। অবশিষ্ট "নাবিয়্যীন" (النبیین), "রাসুল" (رسول), "খাতাম" (خاتم) এই তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন, শেষোক্ত শব্দ দুটো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা "মারযিয়া" নামক গুমরাহ ফিরকার লোকেরা এই

আয়াতের অর্থে ও তাৎপর্যে বিকৃতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এই দুটো শব্দের ভিত্তিতে। তাই এই শব্দগুলো সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ পাঠকদের সামনে পেশ করা প্রয়োজন রয়েছে। রাসুল (رسول) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওহীর মাধ্যমে সম্মানিত করে মানব জাতির প্রতি তাবলীগ ও হিদায়াতের কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, তাকে "রাসুল" (رسول) ও "নবী" (نبي) বলা হয়। এরপর এই দুটো শব্দের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম ও আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

রাসুল ও নবীর অর্থে পার্থক্য

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মত হলো, শরীআতের প্রচলিত অর্থে এই দুটো শব্দ একই অর্থবোধক। অর্থাৎ এগুলোর অর্থে পারস্পরিক কোনো পার্থক্য নেই। যেসব আয়াত, হাদীস ও আরবি বাক্যে একই ব্যক্তি সম্পর্কে কখনো "রাসুল" আবার কখনো "নবী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব উদ্ধৃত করে তারা তাদের বক্তব্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। অধিকাংশ মুতাযিলারও এই মত। এদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, "রাসুল" তুলনামূলকভাবে "নবী" থেকে "আ'ম" (عام) বা সাধারণ ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা নবী হওয়ার জন্য মানুষ হওয়া প্রয়োজন। ফেরেশতাকে নবী বলা যায় না। রাসুল যেভাবে মানুষ হতে পারেন, তেমনি ফেরেশতাও হতে পারেন। কুরআনের অনেক আয়াতে ফেরেশতাদেরকে রাসুল উপাধি দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন: "আর আমাদের রাসুল (ফেরেশতা) ইব্রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছে..." (সূরাহ হুদ, ১১ : ৬৯)

সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত আর পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মত হলো, "নবী" হলো 'আ'ম' বা সাধারণ ব্যাপক অর্থবোধক, আর "রাসুল" হলো নির্দিষ্ট, কেননা শরীআতের প্রচলিত অর্থে রাসুল শুধু ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো কিতাব দেওয়া হয়েছে বা যে নবী পৃথক শরীআত নিয়ে এসেছেন। নবী হওয়ার জন্য দুটোর মধ্যে কোনো শর্ত নেই। যিনি কোনো কিতাব বা শরীআতপ্রাপ্ত নন, তিনি হলেন নবী। (পূর্ববর্তী শরীআত বা সমকালীন শরীআত ও কিতাব প্রচারকারী হবেন)। তার কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী আসবে আর তিনি শরীআতের হুকুম-আহকাম প্রচার করবেন। কিন্তু তার জন্য কোনো নতুন কিতাব ও শরীআতের প্রয়োজন নেই। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এই বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ রয়েছে: "আমি আপনার পূর্বে যে সকল রাসুল ও নবী প্রেরণ করেছি..." (সূরাহ আল-হাজ্জ, ২২ : ৫২) এমনিভাবে এখানে "রাসুল" শব্দের পর "নবী" শব্দটি নির্দিষ্ট করার পর সাধারণ অর্থ ও ভাব বুঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনিভাবে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে: আবু যর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আম্বিয়া এক লাখ চব্বিশ হাজার আগমন করেছেন। তার মধ্যে রাসুল ছিলেন তিনশো পনেরো জন, যাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন আদম (আ.), আর সর্বশেষ মুহাম্মাদ (সা.)।" (এ হাদীসটি ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ, ইবনে আবি শায়বা ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান ও ইবনে আবু শায়বা এটিকে সহীহ বলেছেন, মুসামিরাহ, পৃ. ১৯৩) এই হাদীস সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রাসুল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং নবী রাসুলের তুলনায় অধিক সংখ্যক আগমন করেছেন। অধিকন্তু এই হাদীসে লম্বা চিহ্নওয়ালা বাক্যও উপলব্ধির বিষয়।

তাই জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই বিশ্লেষণকে গ্রহণ করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার (রহ.) সহীহ বুখারির শরাহ "ফাতহুল বারী" গ্রন্থের দ্বাদশ খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠার কিতাবুত তাবীরে এর ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লামা যারকানী শরহে মুয়াত্তায়, ইবনে হুমাম মুসামিরায়, কাযী ইয়ায আশ-শিফায় এর সত্যতা বর্ণনা করেছেন। শরহে আকাঈদে নসফীর হাশিয়াতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এ কথা বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এটা অস্বীকার করে না যে, কোনো কোনো জায়গায় "রাসুল" শব্দ "নবী"র জায়গায়, আর "নবী" শব্দ "রাসুল" এর জায়গায় রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরপর আমরা অবশিষ্ট দুটো শব্দের ব্যাখ্যা পৃথকভাবে নির্ভরযোগ্য অভিধান থেকে পেশ করছি। এরপর পূর্ণ বাক্যের অর্থ আরবি ব্যাকরণের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হবে। 'খাতাম' (خاتم) শব্দের ব্যাখ্যা "খাতাম" (خاتم) শব্দের জন্য আলোচ্য আয়াতে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রয়েছে। যে সমস্ত বুজুর্গ এই শব্দ রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে শুনেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ "খাতাম" (خاتم) এর "ত" যবর-এর সাথে পড়েছেন। এরপর ইমামুল মুফাসসিরীন ওয়াল মুহাদ্দিসীন ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) ও জমহুর মুফাসসিরীন নিজ নিজ তাফসীরে বলেছেন যে, দ্বিতীয় পাঠ "খাতাম" (خاتم) এ "ত" এর উপর যবর দিয়ে দুজন কারী হাসান ও আসেম পড়েছেন। এদের ছাড়া অন্যান্য পাঠ-বিশেষজ্ঞের মতে প্রথম কিরাআত অর্থাৎ "খাতাম" (خاتম) এর "ত" যের দিয়ে পড়া উত্তম। (ইবনে জারীর, ২২খ. পৃ. ১১)

যখন আয়াতে যের ও যবর উভয় কিরাআত বর্তমান রয়েছে, তাই এখন প্রয়োজন হলো যের ও যবর দিয়ে গঠিত উভয় শব্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাঠকদের সামনে পেশ করা। এই উভয় শব্দ আরবি ভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- প্রথম পাঁচটি যের যবর দ্বারা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- ষষ্ঠ অর্থ শুধু যের দ্বারার সাথে নির্ধারিত।
- সপ্তম অর্থ শুধু যবর দ্বারার সাথে নির্ধারিত।

উপরের বর্ণনা দ্বারা এটিই প্রতীয়মান হয় যে, এ দুটো শব্দ সাতটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূর্বোক্ত আয়াতে যের দ্বারা ছয় অর্থের মধ্যে কোন অর্থ হতে পারে এবং যবর দ্বারা ছয় অর্থের মধ্যে কোনটি হতে পারে, তাও দেখা আবশ্যক। সুতরাং এটিও স্পষ্ট যে, প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ (আংটির পাথর ও আংটি) কোনোভাবেই পবিত্র কুরআনে আয়াতের বাস্তবতার নিরিখে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং সমস্ত অভিধান বিশেষজ্ঞ ও দুনিয়ার সকল জ্ঞানীর সর্বসমর্থিত মতে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ যথার্থ বিবেচিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রূপক অর্থ অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ কখনোই হতে পারে না।

চতুর্থ ও পঞ্চম অর্থ এই আয়াতে কোনো মানুষের কল্পনাও হতে পারে না। কেননা তা এই আয়াতে প্রকৃত অর্থেও সঠিক নয়, রূপক অর্থেও নয়। এভাবে সপ্তম অর্থ মোহরের চিত্র ও প্রকৃত অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতের অর্থ হতে পারে না এবং রূপক অর্থ গ্রহণ করার কোনো কারণই নেই।

সুতরাং এখন দুটো অর্থ বিবেচনাযোগ্য। তৃতীয় অর্থ সর্বশেষ জাতি ও ষষ্ঠ অর্থ খতমকারী বা সমাপ্তকারী। এ দুটো অর্থ কোনো লৌকিকতা ছাড়াই প্রকৃত অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, এগুলোর মধ্যে প্রথম অর্থ উভয় পাঠে সঠিক এবং দ্বিতীয় অর্থ শুধু "খাতাম" (خاتم) এর সাথে নির্ধারিত।

মোটকথা, "খাতাম" (خاتم) শব্দের উভয় পাঠ এবং এগুলোর আভিধানিক অর্থের বিস্তারিত আলোচনার ফলে পাঠকবৃন্দ এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, যদি কুরআন ও হাদীসের বিশ্লেষণ এবং সাহাবা ও তাবিঈনের তাফসীর ও পূর্ববর্তী নবীদের সাক্ষ্য থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, আর মীমাংসা শুধু আরবি অভিধানের ভিত্তিতেই করা হয়, তাহলেও তা থেকে এই সিদ্ধান্ত লাভ করা যাবে যে, উপরোক্ত আয়াতে প্রথম পাঠের দুটি অর্থ হতে পারে: সর্বশেষ নবী ও নবীদের সমাপ্তকারী, দ্বিতীয় পাঠের একটি অর্থ হতে পারে অর্থাৎ সর্বশেষ নবী।

কিন্তু যদি প্রকৃত অর্থের ওপর চিন্তা করা হয়, তাহলে উভয়ের সারমর্ম একই বের হয় এবং অর্থের দিকে লক্ষ্য করে এটা বলা যায় যে, উভয় পাঠে আয়াতের অর্থ অভিধানের ভিত্তিতে এই হবে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সকল নবীর মধ্যে সর্বশেষ, তার (সা.) পরে আর কোনো নবীর আগমন হবে না। যেমন তাফসীরে রুহুল মাআনীতে ব্যাখ্যা রয়েছে: "এবং খাতাম একটি যন্ত্রের নাম, যার দ্বারা মোহর লাগানো হয়। তাই 'খাতামুন নাবিয়্যীন' এর অর্থ হবে ঐ ব্যক্তি দ্বারা নবীগণের ক্রমধারা সমাপ্ত করা হয়েছে আর এই অর্থের মূল কথা হলো সর্বশেষ নবী।" (রুহুল মাআনী, ৭খ. পৃ. ৫৯)

আল্লামা আহমাদ ওরফে মোল্লা জিউন স্বীয় তাফসীরে আহমাদীর মধ্যে এ শব্দের তাফসীর করে বলেছেন, "উপর্যুক্ত দুটি পদ্ধতি শুধু শেষ অর্থটি বুঝায়, তাই তাফসীরে মুদারিকে মুফাসসির আসেমের পাঠ যবর-এর তাফসীর সর্বশেষ করেছেন আর বায়যাবী উভয় পাঠের একই তাফসীর করেছেন।"

তাফসীরে রুহুল মাআনী ও তাফসীরে আহমাদীর এই ব্যাখ্যার দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আয়াতে "খাতাম" (خاتم) শব্দের দুটো অর্থ হতে পারে, কিন্তু এর সারমর্ম একটি। তা হলো "আখিরুন নাবিয়্যীন" (اخر النبيين) অর্থাৎ সর্বশেষ নবী বা নবীগণের সর্বশেষ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লামা বায়যাবী উভয় পাঠের তরজমায় কোনো পার্থক্য করেননি, বরং উভয় পদ্ধতিতে "আখিরুন নাবিয়্যীন" (اخر نبيين) (নবীগণের সর্বশেষ) করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা অভিধান পারদর্শীদের উত্তম সওয়াব দান করুন। তারা "খাতাম" (خاتم) শব্দের অর্থ একত্র করেই ক্ষান্ত হননি, বরং আলোচ্য আয়াত সম্পর্কেও স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, সমস্ত অর্থের মাধ্যমে যে শব্দ "খাতাম" (خاتم) এর মধ্যে আভিধানিকভাবে সম্ভাব্য, আলোচ্য আয়াতেও শুধু ঐ অর্থই হতে পারে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-ই সমস্ত নবীর সমাপ্তকারী সর্বশেষ নবী।

আরবি অভিধানরূপে ছোট বড় এবং নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য কতোই লিখিত হয়েছে এবং তা কোথায় কোথায় কোন অবস্থায় বর্তমান আছে, তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তার সবগুলো একত্র করার প্রয়োজন নেই। কোনো মানুষের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। ঐ কিতাবসমূহ আরব ও অনারবের কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণের উপযুক্ত মনে করা হয়। নমুনা স্বরূপ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করে এটাই প্রমাণ করা হবে যে, "খাতাম" আর "খাতিম" এই দুটো শব্দের অর্থের মধ্যে অভিধান পারদর্শীগণ আলোচ্য আয়াতের কোন অর্থ স্থির করেছেন।

মুফরিদাতুল কুরআন

এই কিতাবখানি ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহ.)-এর এরূপ আশ্চর্য রচনা যে, এর উদাহরণ মেলে না। এতে তিনি কুরআনের শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে বর্ণনা করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহ.) স্বীয় আল-ইতকান গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, কুরআনের অভিধান হিসেবে এর চেয়ে উত্তম কিতাব অদ্যাবধি রচিত হয়নি। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এর ব্যাখ্যা হলো: "রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এজন্য খাতামুন্নাবিয়্যীন বলা হয় যে, তিনি (সা.) নবুওয়াতের ক্রমধারাকে সমাপ্ত করে দিয়েছেন। তিনি (সা.) এসে নবুওয়াতকে পূর্ণত্ব দান করেছেন, এর ধারাবাহিকতাকে সমাপ্ত করেছেন।" (মুফরিদাতে রাগিব, পৃ. ১৪২)

আল-মুহকাম লি ইবনিস সাইয়েদা

আরবি শব্দের অভিধান হিসেবে এটিও একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। আল্লামা সুয়ুতি'র মতে কুরআনের ব্যাপারে এর উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করা যেতে পারে। এতে বলা হয়েছে: "এবং খাতিম ও খাতিমা প্রত্যেক বস্তুর শেষ ও সমাপ্তিকে বলা হয়।" (লিসানুল আরব)

তাহযীব লিল-আযহারী

এই কিতাবকেও আল্লামা সুয়ুতি নির্ভরযোগ্য অভিধানের মধ্যে গণ্য করেছেন। এতে বলা হয়েছে: "এবং 'খাতাম' (যেরযুক্ত) ও 'খাতাম' (যবরযুক্ত) নবী করীম (সা.)-এর নামের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো

পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ'র রাসুল ও সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ।" (লিসানুল আরব) এতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "খাতাম" (যেরযুক্ত ও যবরযুক্ত উভয়ই) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামের অংশ এবং কুরআন মাজীদে "খাতামুন নাবিয়্যীন" বলে সর্বশেষ নবী বুঝিয়েছেন। অভিধান বিশেষজ্ঞদের এতো ব্যাখ্যার পরও কোনো ন্যায়বান লোক এই অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ স্থির করতে পারেন বলে মনে করা যায় কি?

লিসানুল আরব

এটি আরবি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ অভিধান গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। আরব ও অনারবদের কাছে তা নির্ভরযোগ্য ও সঠিক গ্রন্থরূপে গণ্য। এই অভিধানে আলোচ্য "খাতাম" বা "খাতিম" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিত হয়েছে: "'খাতাম' ও 'খাতিম' উভয় শব্দের অর্থ সর্বশেষ জাতি। এই অর্থেই 'লিহইয়ানী' হতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ (সা.) হলেন 'খাতামুল আম্বিয়া' বা সর্বশেষ নবী।" এখানেও বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে "খাতিম" বা "খাতাম" যা-ই পড়া হোক "খাতামুন নাবিয়্যীন" আর "খাতামুল আম্বিয়া" এর অর্থ "আখিরুন নাবিয়্যীন" (اخر النبيين) আর "আখিরুল আম্বিয়া" (اخر الانبياء) বা সর্বশেষ নবী।

লিসানুল আরবের এই বাক্যের দ্বারা একটি নীতি জানা যায়। তা হলো, "খাতাম" ও "খাতিম" পাঠেই মূল অভিধানের দৃষ্টিতে শব্দটির বহু অর্থ হতে পারে, কিন্তু যখন জনগোষ্ঠী এর লক্ষ্য হয়, তখন এর অর্থ আখির বা শেষ ও সমাপ্তকারী হয়ে থাকে। সম্ভবত ঐ নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেই "খাতাম" শব্দটি এককভাবে উল্লেখ করা হয়নি, বরং কওম ও জামাআতের সর্বনামের দিকে লক্ষ্য করে বর্ণনা করা হয়েছে। আরবি অভিধানসমূহ পর্যালোচনা দ্বারাও এটিই প্রমাণিত হয় যে, "খাতিম" বা "খাতাম" কোনো কওম বা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ "আখির" বা শেষ-ই হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে "খাতিম" বা "খাতাম" এর সম্পর্ক নবীগণের সমষ্টির সাথে। তাই এর অর্থ "আখিরুন নাবিয়্যীন" (اخر النبيين) বা সর্বশেষ নবী ও নবীগণের সমাপ্তকারী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এই নীতির সমর্থন "তাজুল আরুস শরহে কামূস" থেকেও পাওয়া যায়।

তাজুল আরুস

আল্লামা যুবায়দী শরহে কামুসে লিহইয়ানী থেকে বর্ণনা করেছেন: "রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র নামসমূহের মধ্যে 'খাতিম' বা 'খাতাম' শব্দ অন্যতম। খাতিম ঐ ব্যক্তি, যার আগমনে নবুওয়াত সমাপ্ত করে দিয়েছেন।"

মাজমাউল বিহার

এতে হাদীসের শব্দসমূহের অর্থ নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে একত্র করা হয়েছে। এর বাক্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো: "'খাতিম' ও 'খাতাম' রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। 'খাতাম' এর অর্থ হলো 'সর্বশেষ', আর 'খাতিম' অর্থ হলো সমাপ্তকারী।" এর প্রথম খণ্ডের

৩২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে: "'খাতিম' অর্থ সমাপ্তকারী এবং 'খাতাম' অর্থ মোহর। এর দ্বারা বুঝায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পর কোনো নবী নেই।"

কামূস

এতে বর্ণনা করা হয়েছে: "'খাতিম' কওমের সর্বশেষকে বলা হয়, আর এই অর্থেই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন – 'وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ', অর্থাৎ 'সর্বশেষ নবী'।" এখানে "কাওম" শব্দটি বৃদ্ধি করে উপর্যুক্ত নীতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং আলোচ্য বিষয়টিও অত্যন্ত স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

ইজমার দৃষ্টিতে খতমে নবুওয়াত: একটি অকাট্য ইসলামী বিশ্বাস (আরবী সহ)

খতমে নবুওয়াত, অর্থাৎ নবুওয়াতের সমাপ্তি, ইসলামের একটি মৌলিক এবং সর্বসম্মত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটি কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য (اجماع) দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। ইজমা হলো শরীয়তের তৃতীয় মৌলিক উৎস, যা কুরআন ও হাদীসের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যখন মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণ (ইসলামী আইনবিদ ও পণ্ডিতগণ) কোনো দ্বীনী বিষয়ে একমত হন, তখন সেই সিদ্ধান্ত কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশাবলীর মতোই অবশ্য পালনীয় হয়ে যায়।

ইজমার গুরুত্ব ও খতমে নবুওয়াতের সাথে এর সম্পর্ক

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন। তাঁর পর আর কোনো নিস্পাপ ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই, যার নির্দেশকে নির্ভুল বলে মানা যাবে। এই শূন্যতা পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তকে একজন নিস্পাপ নবীর মর্যাদা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ("আমার উম্মতগণ কখনো ভ্রান্ত মতবাদের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।") এই হাদীস ইজমার গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

'তাওজীহ' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মুজতাহিদগণ যদি কোনো যুগে কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যান, তাহলে তা পালন করা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব হওয়াটা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কারো প্রতি ওহী নাযিল হবে না। এদিকে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, 'اليوم أكملت لكم دينكم' ('আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি'), তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে যেসব হুকুম আহকাম প্রমাণিত হয়েছে, তা দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এ পর্যায়ের সমস্ত ঘটনার বিধান যখন স্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে জানা সম্ভব নয় এবং শরীআতে এ সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে কোনো আহকাম না থাকে, তাহলে দ্বীন পূর্ণাঙ্গ থাকে না। তাই এ উম্মতের লোকদের ইজতিহাদের মাধ্যমে ওহীভিত্তিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান জানার অধিকার রয়েছে।" (তাওহীদ, মিসরী, ১খ. পৃ.৪৯)

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, নবুওয়াত শেষ হওয়ার কারণেই ইজমার গুরুত্ব বেড়েছে। যেহেতু স্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে সমস্ত দৈনন্দিন ঘটনার বিধান জানা সম্ভব নয়, তাই উম্মতের মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে ওয়াহীভিত্তিক প্রয়োজনীয় বিধান জানার অধিকার রাখেন।

ইজমার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা (اجماع الصحابة) সবচেয়ে নিশ্চিত ও অকাট্য। যদি সমস্ত সাহাবা কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, তাহলে তা কুরআনের আয়াতের মতোই অকাট্য বলে গণ্য হয়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন: "إجماع الصحابة حجة قاطعة، يجب العمل به، بل هو أعظم الحجج الشرعية وأقواها" ("ইজমায়ে সাহাবা অকাট্য দলীল হিসেবে গণ্য। তা অনুসরণ করা ফরয, বরং তা শরীআতের জন্য সমস্ত দলীল থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য।") (ইকামাতুদ দলীল, ৩খ., পৃ. ১৩০)

মুসায়লামা কাযযাবের নবুওয়াতের দাবি এবং সাহাবায়ে কিরামের জিহাদ

খতমে নবুওয়াতের উপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমার সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো মিথ্যাবাদী মুসায়লামা কাযযাব (مسلمة الكذاب)-এর বিরুদ্ধে তাদের জিহাদ। রাসুলুল্লাহ

(সা.)-এর জীবদ্দশাতেই মুসায়লামা নবুওয়াতের দাবি করেছিলো। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর খেলাফতকালে এই মিথ্যা নবীর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

মুসায়লামা কাযযাব রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত বা কুরআনকে অস্বীকার করেনি, বরং নিজের নবুওয়াতের দাবি করেছিলো। তার আযানেও "أشهد أن محمدا رسول الله" ("আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ" - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল) বলা হতো। সে নামায-রোযা ও অন্যান্য ইসলামী বিধানও পালন করতো। কিন্তু শুধুমাত্র খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করার কারণে সাহাবায়ে কিরাম তাকে ও তার দলকে কাফির মনে করেছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর নেতৃত্বে সাহাবা, মুহাজির ও আনসারদের এক বিশাল বাহিনী খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-এর অধীনে মুসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামার (اليمامة) দিকে প্রেরিত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ১২০০ সাহাবী ও তাবিঈ শহীদ হন এবং মুসায়লামার চল্লিশ হাজার যোদ্ধার মধ্যে প্রায় আট হাজার নিহত হয়, যার মধ্যে মুসায়লামা নিজেও ছিল।

এই ঘটনা থেকে যে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়:

1. নবুওয়াতের দাবির কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়: সাহাবায়ে কিরাম মুসায়লামা কাযযাবের দাবির পক্ষে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেননি। তারা তাকে মিথ্যাবাদী (কাযযাব) এবং মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পর যে কোনো প্রকারের নবুওয়াতের দাবিই কুফরী।
2. কাদিয়ানী ও তাদের অনুসারীদের দাবি বাতিল: মীর্জা কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীরা নিজেদের নবুওয়াতের দাবিতে "শরীয়তবিহীন", "অস্থায়ী", "ছায়ানবী" বা "আংশিক" নবুওয়াত ইত্যাদি অর্থহীন বাক্যের আশ্রয় নিয়ে খতমে নবুওয়াতের বিষয়টিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে। মুসায়লামার ঘটনার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, তাদের এই চাতুর্য ও মূল বিষয়টির রদবদল তাদেরকে কুফরী থেকে রক্ষা করতে পারে না।
3. একটি হুকুম অস্বীকার করলে কুফরী: যদি কোনো ব্যক্তি ইসলামের সমস্ত ফরয ও আহকাম বিশ্বাস করে এবং পালন করে, কিন্তু শরীআতের একটি অকাট্য হুকুম অস্বীকার করে, তাহলে তা সুস্পষ্ট কুফরীরূপেই চিহ্নিত হবে। মুসায়লামা ও তার দল নামায-রোযা আদায় করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করার কারণে কাফির বিবেচিত হয়েছিলো।
4. সংখ্যাধিক্য সত্যতার প্রমাণ নয়: মুসায়লামা কাযযাবের অনুসারীদের সংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশি ছিল, কিন্তু তা তাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়নি। তাদের এই সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের হাতে মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পারেনি। এটি প্রমাণ করে যে, মীর্জা কাদিয়ানীর অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য তার সত্যতার কোনো দলীল হতে পারে না।

5. ইসলাম থেকে বহিষ্কার: সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী থেকে যে দল অন্য কোনো নবুওয়াতের দাবিদারের আনুগত্য প্রকাশ করবে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে বহিষ্কৃত বলে গণ্য হবে। তাদের সাথে ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকদের মতোই আচরণ করা হবে, এবং দুর্বল মুহূর্তেও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে না।

ইজমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

বিভিন্ন ইসলামী পণ্ডিত ও ফকীহগণ খতমে নবুওয়াতের উপর ইজমার বিষয়টি তাদের গ্রন্থাবলীতে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন:

- কাযী ইয়াজ (القاضي عياض) তার 'শিফা' (الشفاء) নামক গ্রন্থে বলেন: "কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন সর্বশেষ নবী এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো নবী হবে না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেও সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নবীদের সমাপ্তকারী এবং এর উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে। এই বাক্যটি সম্পূর্ণ স্বীয় বাহ্যিক অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকাশ্য বাক্যের দ্বারা এর যে অর্থ বুঝা যায়, কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া এটাই তার প্রকৃত অর্থ। সুতরাং যারা তা অস্বীকার করবে, তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটা অকাট্য ও ইজমায়ী আকিদা।"
- সাইয়্যেদ মাহমুদ আলূসী (السيد محمود الآلوسي) তার তাফসীরে 'রুহুল মাআনী' (روح المعاني) তে লিখেছেন: "وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نص عليه الكتاب وصدع به السنة وأجمعت عليه الأمة، فالمدعي للنبوة بعده كافر، فإن لم يتب قتل" ("এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ'র কিতাব স্পষ্টভাষী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তা উদঘাটিত ও প্রতিভাত করেছে এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। অতঃপর নবুওয়াতের দাবি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং নবুওয়াতের দাবিদার কাফির। যদি সে তাওবা না করে, তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে।") (রুহুল মাআনী, ৭খ.)
- ইবনে হাজার মাক্কী (ابن حجر المكي) তার 'ফাতাওয়া' (الفتاوى) নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন: "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো ব্যক্তি কোনো ওহীর উপর বিশ্বাসী হলে সে সমস্ত মুসলমানের ইজমা অনুযায়ী কাফির।"
- মোল্লা আলী কারী (ملا علي القاري) 'শরহে ফিকহে আকবর' (شرح الفقه الأكبر) নামক গ্রন্থে লিখেছেন: "এবং আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুওয়াতের দাবি করা সর্বসম্মতভাবে কুফরী।"

এই সকল উক্তি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো প্রকার নবীর আগমন সম্ভব নয় এবং এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর পূর্ণ ইজমা (إجماع كامل) রয়েছে। যে ব্যক্তি এরূপ দাবি করবে, সে এবং তার সকল অনুগামী মুরতাদ (مرتد) বা ধর্মত্যাগী হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা: বাংলাদেশের সংবিধান কাদিয়ানীদের জন্য অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতোই ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সুরক্ষার বিধান করে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠী তাদের "অমুসলিম" মনে করে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবি করে আসছে, সংবিধানের বর্তমান কাঠামোতে তাদের সেই দাবি সরাসরি কার্যকর করার কোনো সুযোগ নেই, যতক্ষণ না সংবিধান সংশোধিত হয়।

এখানে সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা উল্লেখ করা হলো যা কাদিয়ানীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করে:

১. অনুচ্ছেদ ৪১: ধর্মীয় স্বাধীনতা এই অনুচ্ছেদটি বাংলাদেশের সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়।

- ধারা ৪১(১)(ক): "আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।"
  - এর অর্থ হলো, কাদিয়ানীরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালন করতে এবং প্রচার করতে পারে, যতক্ষণ না তা দেশের প্রচলিত আইন, জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতার পরিপন্থী হয়।
- ধারা ৪১(১)(খ): "প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।"
  - এই ধারা কাদিয়ানীদের জন্য তাদের নিজস্ব মসজিদ (যা তারা 'আহমদিয়া মসজিদ' বলে) বা উপাসনালয় স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার অধিকার নিশ্চিত করে।

২. অনুচ্ছেদ ২৮: ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য করা যাবে না

- ধারা ২৮(১): "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।"
  - এটি নিশ্চিত করে যে, কাদিয়ানী হওয়ার কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।
- ধারা ২৮(২): "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবে।"
  - যদিও এটি সরাসরি ধর্মীয় বৈষম্য নিয়ে নয়, তবে এটি সামগ্রিকভাবে বৈষম্যহীনতার নীতিকে শক্তিশালী করে।

৩. অনুচ্ছেদ ২৯: সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা

- ধারা ২৯(২): "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।"

- এর মানে হলো, কাদিয়ানী হওয়ার কারণে কাউকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য করা যাবে না।

৪. অনুচ্ছেদ ৩১: আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার

- "আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।"
  - এই ধারা কাদিয়ানীদের জীবন, স্বাধীনতা, দেহ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং আইন বহির্ভূত যেকোনো আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করে।

৫. অনুচ্ছেদ ৩২: জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ

- "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।"
  - এই ধারা কাদিয়ানীদের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা ও এর ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism)। যদিও অষ্টম সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিও সংবিধানে বহাল আছে। সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে:

- কোনো প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা;
- রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান;
- রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার; এবং
- কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর উৎপীড়ন দূর করা হবে।

এই নীতিগুলো অনুযায়ী, রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না এবং কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য বা নিপীড়নও করবে না। এর ভিত্তিতে, কাদিয়ানীরা, যদিও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের চোখে অমুসলিম, সংবিধানের অধীনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মতোই সমান অধিকার ভোগ করে।

হাইকোর্টের রায় প্রসঙ্গে: ১৯৯৩ সালে হাইকোর্টের একটি রায়ে কাদিয়ানীদের 'অমুসলিম' বা 'কাফের' ঘোষণা করা হলেও, এই রায়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অমুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি বা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে খর্ব করেনি। এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট মামলার প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত বিচারিক পর্যবেক্ষণ ছিল এবং এর ভিত্তিতে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

বাংলাদেশের সংবিধান কাদিয়ানীদের মতো সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের জন্য মৌলিক অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অমুসলিম ঘোষণা না করার ফলে, তারা সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত এবং তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে।

বাংলাদেশের মূল ধারার আলেমগণ কাদিয়ানীদের অমুসলিম দাবি করে আসছেন । রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার মাধ্যমে তাদেরকে আইনীভাবে প্রতিরোধ করা যাবে।

. ধর্মীয় ও আত্মিক সম্পর্ক বর্জন:

এটি বয়কটের মূল ভিত্তি। যেহেতু সুন্নি মুসলমানরা কাদিয়ানীদের অমুসলিম মনে করে, তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সাথে কিছু নির্দিষ্ট সম্পর্ক বর্জন করা হয়:

- বিবাহ বন্ধন: কাদিয়ানীদের সাথে মুসলমান ছেলে-মেয়েদের বিবাহ বন্ধন করা থেকে বিরত থাকা। ইসলামী আইন অনুযায়ী, একজন মুসলমান পুরুষ আহলে কিতাব (ইহুদি বা খ্রিস্টান) নারীকে বিয়ে করতে পারলেও, অমুসলিম নারীকে বিয়ে করতে পারে না। কাদিয়ানীদের অমুসলিম হিসেবে গণ্য করায়, তাদের সাথে বিবাহ বন্ধন জায়েজ মনে করা হয় না।
- জানাজার নামাজ ও দাফন: কাদিয়ানীদের জানাজার নামাজ পড়া এবং তাদের মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা থেকে বিরত থাকা।
- মুসলিম নাম ব্যবহার থেকে নিরুৎসাহিত করা: তাদেরকে মুসলিমদের প্রচলিত নাম ব্যবহার থেকে নিরুৎসাহিত করা, যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয়।
- ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করা: তাদের ধর্মীয় সভা, জলসা বা অন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।
- তাদের ইমামের পেছনে নামাজ না পড়া: কাদিয়ানীদের ইমামের পেছনে নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকা, কারণ তাদের বিশ্বাস মুসলিমদের থেকে ভিন্ন।

২. সামাজিক মেলামেশা ও সম্পর্ক সীমিতকরণ:

এটি এমন একটি দিক যেখানে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। যদিও পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ না করে, কিছু মেলামেশা সীমিত করা যেতে পারে:

- ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক সীমিত করা: মুসলিমদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা অমুসলিমদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তৈরি করতে নিরুৎসাহিত হন, যদি এর দ্বারা নিজের ঈমান বা আকীদা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা পরিহার: তাদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে, বরং তাদের মতবাদ সম্পর্কে সতর্ক থাকা।

- তাদের উৎসব বা কার্যক্রমে অংশ না নেওয়া: তাদের সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা, যা তাদের মতবাদকে সমর্থন করে বলে মনে হতে পারে।

৩. অর্থনৈতিক সম্পর্ক সীমিতকরণ :

অর্থনৈতিক বয়কট একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং বিতর্কিত পদক্ষেপ। এর ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি হতে পারে।

- তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য বা সেবা ক্রয় না করা: কিছু গোষ্ঠী এই পরামর্শ দিয়ে থাকে যে, কাদিয়ানীদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য বা সেবা ক্রয় করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে, এটি বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন এবং এটি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে।
- তাদের কর্মসংস্থান বা ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে না যাওয়া: তাদের সাথে কোনো ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব বা কর্মসংস্থান এড়িয়ে চলার একটি প্রবণতা দেখা যায়।

৪. জ্ঞানভিত্তিক ও দাওয়াতি কার্যক্রম জোরদার করা:

এটিই সবচেয়ে কার্যকর এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি।

- সঠিক তথ্য প্রচার: মুসলিম উম্মাহকে কাদিয়ানীদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানানো, তাদের বইপত্র ও প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য উন্মোচন করা।
- খতমে নবুওয়াত গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন: খতমে নবুওয়াতের উপর গবেষণা ও প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, যা দলিল-প্রমাণ সহকারে কাদিয়ানী মতবাদের ভ্রান্তি তুলে ধরবে।
- গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয়তা: সংবাদপত্র, টেলিভিশন, ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদি গণমাধ্যম ব্যবহার করে কাদিয়ানীদের মতবাদ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং খতমে নবুওয়াতের পক্ষে ইসলামের অকাট্য অবস্থান তুলে ধরা।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তিকরণ:

- ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে: ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে 'খতমে নবুওয়াত' এর গুরুত্ব, এর অর্থ ও তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পাশাপাশি, নবুওয়াতের দাবীদারদের সম্পর্কে (যেমন মুসায়লামা কাযযাব) ঐতিহাসিক আলোচনা এবং তাদের ভ্রান্তি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে কাদিয়ানী মতবাদের নাম উল্লেখ না করে তাদের মূল ভ্রান্তিটি (অর্থাৎ খতমে নবুওয়াত অস্বীকার) তুলে ধরা যেতে পারে।
- নৈতিক শিক্ষা/সাধারণ জ্ঞানে: সাধারণ জ্ঞান বা নৈতিক শিক্ষা বিষয়েও সংক্ষেপে খতমে নবুওয়াত এবং ধর্মীয় চরমপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান ও সহনশীলতা বিকাশে সহায়তা করবে।

২. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ: ইসলাম শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য খতমে নবুওয়াত এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ (কাদিয়ানী মতবাদ সহ) সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে শিক্ষকরা সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছে নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন করতে পারবেন।
- সচেতনতামূলক কর্মশালা: শিক্ষকদের জন্য কাদিয়ানী মতবাদের প্রসারের কৌশল, তাদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি এবং শিক্ষার্থীদের কিভাবে এই বিষয়ে সতর্ক করা যায়, সে বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা।

৩. আলোচনা সভা ও সেমিনার:

- নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা: স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়মিত বিরতিতে খতমে নবুওয়াত এবং সহিহ ইসলামী আকীদা বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় আলেম-উলামাদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
- বিশেষ সেমিনার/ওয়ার্কশপ: বার্ষিক বা অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে বড় পরিসরে সেমিনার বা ওয়ার্কশপের আয়োজন করা, যেখানে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও অংশ নিতে পারবেন।
- প্রশ্নোত্তর পর্ব: আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের মনে জেগে থাকা প্রশ্নগুলো করতে পারে এবং সঠিক উত্তর পেতে পারে।

৪. লাইব্রেরিতে বই সরবরাহ:

- ইসলামী বই ও গবেষণাপত্র: স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার লাইব্রেরিতে খতমে নবুওয়াত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বই, গবেষণাপত্র এবং ফতোয়া সরবরাহ করা। পাশাপাশি, কাদিয়ানী মতবাদের অসারতা তুলে ধরা হয়েছে এমন বইও রাখা যেতে পারে।
- সহজবোধ্য প্রকাশনা: শিক্ষার্থীদের উপযোগী সহজবোধ্য ভাষায় লেখা ছোট পুস্তিকা ও লিফলেট বিতরণ করা।

৫. বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও কুইজ:

- খতমে নবুওয়াত বিষয়ক প্রতিযোগিতা: খতমে নবুওয়াতের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করতে উৎসাহিত হবে।
- পুরস্কার প্রদান: বিজয়ীদের পুরস্কৃত করে তাদের উৎসাহ বাড়ানো।

৬. অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা:

- অভিভাবক সভা: অভিভাবক-শিক্ষক মিটিংয়ে খতমে নবুওয়াতের গুরুত্ব এবং কাদিয়ানী মতবাদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা।
- সচেতনতামূলক বার্তা: অভিভাবকদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে বার্তা বা লিফলেট বিতরণ করা।

বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে (চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন) কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার বা সমর্থন থেকে বিরত রাখতে চাইলে বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। যেহেতু দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত সামাজিক সেবার আড়ালে কাজ করে, তাই তাদের কার্যক্রমের ওপর নজর রাখা এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এখানে কিছু সম্ভাব্য করণীয় তুলে ধরা হলো:

১. সরকারি নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা

- নিবন্ধন ও কার্যক্রমে তদারকি: সরকার, বিশেষ করে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর, দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং তাদের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি বাড়াতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিলের উৎস, ব্যয়ের খাত এবং প্রচারণার বিষয়বস্তু নিয়মিত নিরীক্ষা (audit) করা উচিত।
- ধর্মীয় মতবাদের প্রচার রোধে নীতিমালা: দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো যেন তাদের সেবামূলক কার্যক্রমের আড়ালে কোনো বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ (যেমন কাদিয়ানী মতবাদ) প্রচার করতে না পারে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য যেন ধর্মীয় রূপান্তরের মাধ্যম না হয়, তা নিশ্চিত করা।

- আইন প্রয়োগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা: যদি কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান তাদের নিবন্ধন শর্ত ভঙ্গ করে বা ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে নিবন্ধন বাতিল, কার্যক্রম স্থগিত এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যেতে পারে।
- গোয়েন্দা সংস্থার সক্রিয়তা: বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের ওপর নজর রাখতে পারে, বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে বা সন্দেহজনকভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করে।

২. জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য প্রচার

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা: স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং মসজিদগুলোতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আড়ালে পরিচালিত সম্ভাব্য ধর্মীয় প্রচারণার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো। স্থানীয় আলেম-উলামা ও শিক্ষাবিদদের মাধ্যমে এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- গণমাধ্যমে প্রচার: বিভিন্ন গণমাধ্যম (সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন পোর্টাল) ব্যবহার করে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আড়ালে পরিচালিত সন্দেহজনক ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মুখোশ উন্মোচন করা যেতে পারে।
- স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা: স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং স্থানীয় মুসলিম সংগঠনগুলোকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের ওপর নজর রাখতে এবং কোনো অস্বাভাবিকতা দেখলে প্রশাসনকে অবহিত করতে উৎসাহিত করা।

৩. আর্থিক উৎস ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

- তহবিল নিরীক্ষা: দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো কোথা থেকে তহবিল সংগ্রহ করছে, বিশেষ করে বিদেশি অনুদান, সেগুলোর উৎস ও ব্যয়ের বিষয়ে আরও কঠোর নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। যদি দেখা যায় যে কোনো বিদেশি সংস্থা কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারে সহায়তা করছে, তাহলে তাদের অনুদান বন্ধের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
- দাতব্য সেবার মানদণ্ড: দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মানদণ্ড ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করা, যাতে তারা সেবার নামে ভিন্ন কোনো এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে না পারে। যেমন, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি ধর্মীয় পুস্তক বিতরণ বা নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত করার চেষ্টা নিষিদ্ধ করা।

৪. বিকল্প দাতব্য কার্যক্রম জোরদার করা

- মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা: মুসলিমদের নিজস্ব দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও শক্তিশালী করা এবং তাদের কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো, যাতে কাদিয়ানী দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সাধারণ মানুষের নির্ভরতা কমে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তাদের কার্যক্রমে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো অভিযোগের সুযোগ না থাকে এবং জনগণের আস্থা বজায় থাকে।

উপসংহার

খতমে নবুওয়াত ইসলামের একটি অকাট্য ও মৌলিক বিশ্বাস, যা কুরআন, হাদীস এবং মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা সর্বসম্মত ঐকমত্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষ নবী, তাঁর পর আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না — এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানরা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে আসছেন। সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই বিশ্বাস এতই দৃঢ় যে, এর অস্বীকারকারীকে কাফির হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ এবং তৎকালীন সাহাবীদের সর্বসম্মত অবস্থান এর জ্বলন্ত প্রমাণ। মুসায়লামা নামায-রোযা আদায় করা সত্ত্বেও এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নবুওয়াতের দাবীদার হওয়ায় তাকে মুরতাদ ঘোষণা করা হয়েছিল, যা খতমে নবুওয়াতের অকাট্যতাকে আরও সুদৃঢ় করে।

বাংলাদেশে কাদিয়ানী বা আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ঘিরে চলমান বিতর্ক এই মৌলিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। যদিও তারা নিজেদের মুসলমান দাবি করে, খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করার কারণে মূলধারার মুসলমানরা তাদের অমুসলিম মনে করে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবি জানায়। এই পরিস্থিতিতে, সংবিধান কাদিয়ানীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে । তাই তাদের আগে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।

এ কাদিয়ানী মতবাদের প্রভাব রোধে জ্ঞানভিত্তিক প্রতিরোধ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা সম্ভব। একই সাথে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আড়ালে পরিচালিত সম্ভাব্য ধর্মীয় প্রচারণার ওপর সরকারি নজরদারি বাড়ানো এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

তবে, এই পুরো প্রক্রিয়ায় সহিংসতা ও বিদ্বেষ পরিহার করা অপরিহার্য। শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত উপায়ে সচেতনতা তৈরি করা এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো জ্ঞান, যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সত্যকে তুলে ধরা, যা কোনো ধরনের জোর-জবরদস্তি বা সহিংসতার মাধ্যমে ধর্ম প্রচারে বিশ্বাস করে না। তাই, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, কুরআন ও হাদিস এর আলোকে খতমে নবুওয়াতের পবিত্র বিশ্বাসকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

রেফারেন্স:

https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/NatunNakib/30238566
https://www.alkawsar.com/bn/article/2598/
https://www.bbc.com/bengali/articles/c72z0jvllq4o
https://at-tahreek.com/site/show/21 https://at-tahreek.com/article_details/5845

https://alitisam.com/article_details/367https://thegreatestnation.wordpress.com/2019/03/14/%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%AE-2/ open AI